বড় গল্প

রক্তবীজ

রূপক সাহা

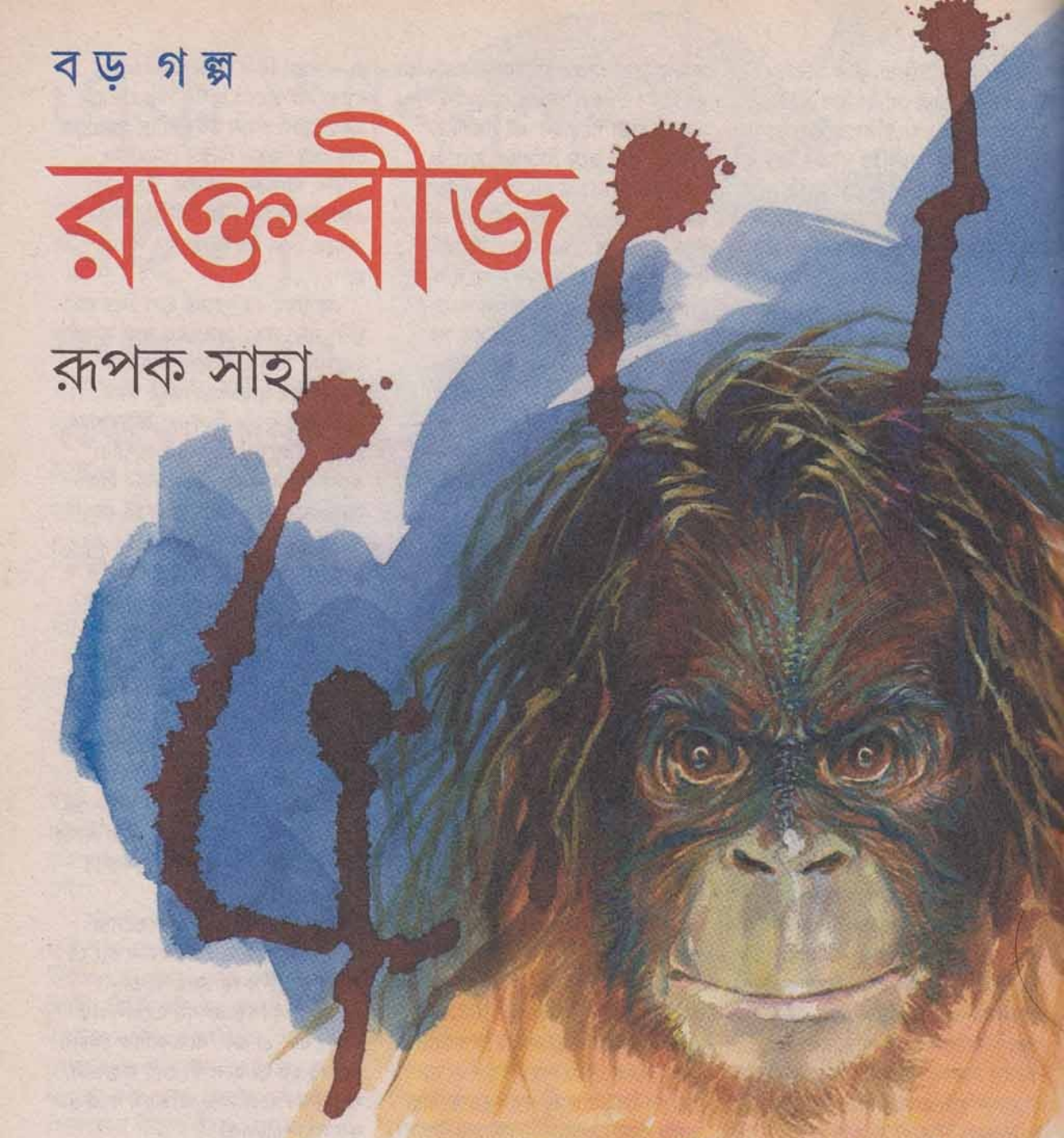

সুদীশকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। ইস্টবেঙ্গল জাতীয় ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই ও যেন আকাশে উড়ছে। সেদিন ক্যালকাটা ক্লাবে কী একটা অনুষ্ঠান ছিল। দেখা হতেই আমাকে বলল, "এই কালকেতু, তোকেই খুঁজছিলাম। তুই তো ফুটবলের অনেক খোঁজ রাখিস। একটা খবর দিতে পারবি?"

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

নিশ্চয়ই ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে কোনও উদ্ভট প্ল্যান ওর মাথায় এসেছে। সেটা আন্দাজ করেই বললাম, "কী খবর রে?"

"এই রিয়াল মাদ্রিদ টিমটাকে যদি কলকাতায় একটা ম্যাচ খেলার জন্য নিয়ে আসি, তা হলে কত খরচা হতে পারে রে?"

প্রশ্নটা শুনে মনে-মনে হাসলাম। রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবের বয়ে গেছে কলকাতায় খেলতে আসার জন্য। আমি জানি, দু' বছর আগে তাইল্যান্ড ফুটবলের কর্তারা একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য ওদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমাদের টাকায় দু'কোটি চেয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তাও তখন ওদের টিমে জিদান ছিল না। এখন তো ম্যাচ ফি আরও বেশি চাইবে। আড়াই থেকে তিন কোটিও চাইতে পারে। আমাদের দেশে ক্রিকেট ম্যাচ হলে তাও টাকাটা তোলা যেত। কিন্তু একটা ফুটবল ম্যাচের জন্য কোন স্পনসর দেবে অত টাকা?

সুদীশকে অত কথা বলে কোনও লাভ নেই। তাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম, "ওরা ম্যাচটা খেলবে কার সঙ্গে?"

"অবভিয়াসলি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। এশিয়ার আর কোন টিমই বা আছে? কত ম্যাচ ফি নেবে, তোর কোনও আন্দাজ আছে?"

খুব হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসলে সুদীশ মারাত্মক দুঃখ পাবে। তাই হাসি চেপে রেখে উত্তর দিয়েছিলাম, "রিয়াল মাদ্রিদ কত টাকা নেবে, সেটা নির্ভর করছে তুই কাকে দিয়ে অ্যাপ্রোচটা করাবি, তার উপর। মাদার টেরিজা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হলে তোদের খুব সুবিধা হত। স্পেনের লোকেরা মাদার টেরিজাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। উনি বললে রিয়াল মাদ্রিদ বিনে পয়সায়ও একটা ম্যাচ খেলে দিতে পারত।"

শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সুদীশ, "মাদার টেরিজা তো নেই। এখন কাকে দিয়ে রিকোয়েস্টটা করানো যায় বল তো কালকেতু?"

ওকে এড়ানোর জন্য বলেছিলাম, "দাঁড়া, তা হলে ভাবতে হবে।"

মাঝে সুদীশের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। আমি নিজেও একটু

ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, লেখালিখি নিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদ নিয়ে সুদীশের পাগলামির কথা আমার মনেও ছিল না। হঠাৎ একটু আগে মোবাইলে ওর ফোন। গলাটা বেশ গম্ভীর। আমাকে বলল, "তুই এখন কোথায় রে কালকেতু?"

বললাম, "বাড়িতে।"

"আমি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে বলছি। তোর সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। এখন যদি যাই, তা হলে দেখা হবে?"

বেলা এগারোটার সময় আমার একবার কুঁদঘাটের দিকে যাওয়ার কথা আছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এখন সাড়ে ন'টা। সুদীশ যদি আসে তা হলে আমার কোনও অসুবিধে নেই। বললাম, "আয় তা হলে।"

"আসছি।" বলেই সুদীশ লাইনটা কেটে দিল।

ওর ব্যস্ততা দেখে আমার একটু অবাকই লাগল। গলাটা শুনেও। সুদীশের সঙ্গে আমার পরিচয় ও যখন লালবাজারে গোয়েন্দা দফতরে ছিল। সে আট-দশ বছর আগেকার কথা। সাংবাদিকতা করার ফাঁকে তখন আমিও মাঝেমধ্যে রহস্যভেদের কাজ করি। কেউ অনুরোধ করলে না করতে পারতাম না। সুদীশ নাগ আমারই বয়সী। কোনও একটা কারণে তখন ওকে আমার খুব ভাল লেগে যায়। পুলিশে অত গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করা সত্ত্বেও সেই সময় সুদীশ রোজ ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখতে আসত। মাঝেমধ্যে মাঠেই ওর সঙ্গে দেখা হত। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় রহস্যভেদে সুদীশ কীভাবে আমার সাহায্য নিয়েছে, সে গল্প আমি আনন্দমেলার পূজাসংখ্যায় বেশ কয়েকবার লিখেওছি।

কোনও সন্দেহ নেই, সুদীশ খুব দক্ষ অফিসার। মাঝে জেলা পুলিশে বদলি হয়েছিল। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগে আছে। থাকে ভবানী ভবনের কাছেই একটা কোয়ার্টারে। এই সাতসকালে ও ইস্টার্ন বাইপাসে গেছে। তার মানে, ওখানে কোথাও গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে ব্যাপারেই হয়তো আমার কোনও সাহায্য নিতে চায়। ও না-আসা পর্যন্ত কিছু বোঝা যাবে না।

সকালবেলায় গল্‌ফ খেলে আসতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেছিল। তাই খবরের কাগজটায় ভাল করে চোখ বোলানোর সুযোগ পাইনি। হাতের কাছে 'দ্য টেলিগ্রাফ' কাগজটা দেখে টেনে নিলাম। প্রথম পাতায় ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধের বড়-বড় সব খবর। মাসখানেক হয়ে গেল। একতরফা যুদ্ধের খবর পড়তে আর এখন ভাল লাগে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কতগুলি নিরীহ মানুষের মৃত্যুর খবর জানতে কারই বা ইচ্ছে করে? তাই পাতা উলটে যেতে লাগলাম। হঠাৎই একটা খবরে চোখ আটকে গেল।

"উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে নরদানব"

দ্রুত খবরটা একবার পড়ে নিলাম। গাজিয়াবাদের লোকজন ইদানীং সন্ধের পর রাস্তায় বেরোতে খুব ভয় পাচ্ছেন। রাতের দিকে এক নরদানবকে দেখা যাচ্ছে। অতর্কিতে সে লোকজনকে আক্রমণ করছে। গবাদি পশু মেরে ফেলছে। ওই অঞ্চলে খুবই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। নরদানব নাকি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়েই আবার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। নরদানবের আক্রমণে ইতিমধ্যেই পাঁচজন মারাত্মক ঘায়েল হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। স্থানীয় এক ফোটোগ্রাফার ওই নরদানবের ছবি তুলেছিল। অন্ধকারে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে তোলা। ছবিটা খুব ভাল ওঠেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে, নরখাদক খুবই হিংস্র ধরনের। মুখটা রাক্ষসের মতো। গায়ে বড় বড় লোম, হাতে ধারালো নখ। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও নরদানবের হদিস পায়নি।

খবরের সঙ্গে ছবিটাও ছাপা হয়েছে। কৌতূহল হওয়ায় খুঁটিয়ে ছবিটা দেখতে লাগলাম। ফ্ল্যাশ লাইটে নরদানবের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। নেকড়ে বা বাঘের চোখ যেমন অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। মনে হল, নরদানবের হাইট খুব বেশি না। মেরেকেটে পাঁচ ফুটের কাছাকাছিই হবে। পুরো শরীরের তুলনায় হাত দুটো সামান্য বড়। প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি নেমে এসেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত কোনও মানুষ মুখোশ পরে, কোনও বিশেষ কারণে এই ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে কি না, প্রথমেই সেই ভাবনাটা মাথায় এল। পরে সেই ভাবনাটা সরিয়ে দিলাম। তার কারণ, নরদানবের চোখ। চোখ দুটোয় কিছু আছে। দেখলেই সাধারণ লোকের ভয় পাওয়ার কথা।

মাঝেমধ্যেই এই ধরনের চাঞ্চল্যকর খবর কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, স্টোনম্যান। আমাদের এই কলকাতাতেও বেশ কয়েক বছর আগে স্টোনম্যানের আবির্ভাব হয়েছিল। রাতের দিকে স্টোনম্যান ফুটপাতে শুয়ে থাকা নিরীহ মানুষদের পাথর দিয়ে মেরে ফেলত। পরপর এরকম এগারোটা ঘটনা সেসময় কলকাতা পুলিশের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। স্টোনম্যানকে পুলিশ ধরতে পারেনি। রহস্যও ভেদ করতে পারেনি। বহুদিন আগে আমি একবার কথায় কথায় সুদীশকে স্টোনম্যানের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আদৌ স্টোনম্যান বলে কেউ ছিল, নাকি পুরো রহস্যটাই বিশেষ কোনও কারণে পুলিশের বানানো? প্রশ্নটা শুনে ও মুচকি হেসেছিল। উত্তর দিতে চায়নি।

গাজিয়াবাদের নরদানবও এরকম রহস্য হতে পারে। আশ্চর্যের কিছু নেই। উত্তরপ্রদেশের ওই এলাকাটা অপরাধপ্রবণ অঞ্চল। দুবাইয়ের মাফিয়া ডনদের ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ওই শহর থেকে ধরা পড়েছে। মাদক চালানকারীদেরও স্বর্গরাজ্য। হয়তো মাদক পাচারকারী দলের সঙ্গে এই নরদানব রহস্যের কোনও সম্পর্ক আছে। হয়তো কেন, হতেও পারে। রাতের দিকে ওরা এখন বিশেষ কোনও অপারেশন চালাচ্ছে। চায় না, রাতের দিকে কেউ ঘর থেকে বেরোক। যাতে বিনা বাধায় নিজেদের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। কাগজটা ভাঁজ করে সেন্টার টেবিলে রাখার সময় মনে হল, এরকম একটা রহস্যভেদের কাজ পেলে মন্দ হত না।

বাড়িতে আজ কেউ নেই। ফুল্লরা... মানে আমার স্ত্রী গতকালই দিল্লিতে গেছে। অযোধ্যায় রামমন্দির নিয়ে কী একটা আলোচনাসভা আছে। সেখানে বক্তৃতা দেবে। দিনচারেক ও দিল্লিতে থাকবে। তাই সকালে ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে। সোফা ছেড়ে উঠে কিচেনের দিকে এগোচ্ছি। এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল। তার মানে সুদীশ এসে গেছে। নাহ, আজ আর ব্রেকফাস্ট তৈরি করার সময় পাওয়া যাবে না। আমার গল্‌ফ গ্রিনের বাড়ির সামনেই লেক গার্ডেন্সের মোড়। সেখানে অনেক রেস্তরাঁ। কুঁদঘাট যাওয়ার পথে কোনও একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়তে হবে। কথাটা ভাবতে ভাবতে দরজাটা খুলে দিলাম।

হ্যাঁ, সুদীশই। হাতে পলিথিনের বড় প্যাকেটে কী ঝোলানো। ড্রয়িংরুমে পা বাড়িয়ে ও বলল, "ব্রেকফাস্ট করে বেরোইনি। তোদের এখানকার লেক ক্লাব থেকে তাই খাবার কিনে আনলাম।"

প্যাকেট দেখেই হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল। হাসিমুখে বললাম, "ভাল করেছিস। আমিও ব্রেকফাস্ট করিনি। চল, খেতে-খেতেই কথা সেরে নিই।"

প্যাকেটে প্যাটিস, স্যান্ডউইচ। সব ছ'টা করে। সুদীশ জানে না, ফুল্লরা বাড়িতে নেই।

ওকে গুনতি করে ও জিনিসগুলো কিনেছে। ভালই হল, কিছু ফ্রিজে রেখে দেওয়া যাবে। কিচেনেট থেকে দুটো ডিশ বের করে এনে প্যাটিস আর স্যান্ডউইচ তুলে নিলাম। তারপর খেতে-খেতে বললাম, "এবার বল, তোর জরুরি দরকারটা কী?"

সুদীশ বলল, "আর বলিস না। একটা ঝামেলায় পড়েছি। দিল্লির ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে হঠাৎ একটা মেসেজ এসেছে। ডঃ জীমূতবাহন ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোক কলকাতা শহরে আত্মগোপন করে আছেন। দু'দিনের মধ্যে তাঁকে যে-করেই হোক, আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"ভদ্রলোকটি কে?"

"ডিটেল্‌স জানি না। এটুকু জানি, উনি একজন বিজ্ঞানী, বায়োলজিস্ট।"

"কলকাতায় থাকেন, না বাইরে থেকে এসেছেন?"

"বাইরে থেকে এসেছেন। গতকাল অথবা পরশু।"

"কোত্থেকে এসেছেন?"

"সম্ভবত গাজিয়াবাদ। ভায়া দিল্লি।"

"একটা কথা, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিল না কেন?"

"কারণ আছে। হাইলি সিক্রেট। নিশ্চয়ই মিনিস্ট্রির কাছে উনি ইম্পর্ট্যান্ট লোক। উনি যে কলকাতায় এসেছেন, সেটা মিনিস্ট্রি পাঁচকান করতে চায় না। এমনও হতে পারে অন্য কেউ জানলে, ভদ্রলোকের ক্ষতি হতে পারে।"

"তা হলে আমায় বললি কেন?"

"আমার ইচ্ছেয় নয়। তুই মিঃ পদ্মনাভন বলে কাউকে চিনিস? ডিফেন্স মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি গোছের অফিসার। উনিই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কাল হঠাৎই আমাকে তোর নামটা উনি করলেন। বললেন, প্রয়োজন হলে তোর সাহায্য নিতে। মিনিস্ট্রির কোনও আপত্তি নেই।"

পদ্মনাভন বলে দিল্লির কাউকে চট করে আমার মনে পড়ল না। হতে পারে কোথাও আমার নামটা উনি শুনেছেন। বা কোথাও আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। খেলার সাংবাদিকতা করার সূত্রে প্রায়ই কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। দিল্লিতে বছরে তিন-চারবার করে যাওয়া হয়ে যায়। একটু ভাবতেই মনে হল, ডুরান্ড কাপের সময় মিঃ পদ্মনাভন নামে একজনের সঙ্গে গতবার আলাপ হয়েছিল। ওই টুর্নামেন্ট চালান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির লোকেরা। কারও সঙ্গে নেমকার্ড দেওয়া নেওয়া হলে আমি তা যত্ন করে রেখে দিই। পরে আমার নেমকার্ড হোল্ডারে দেখে নিতে হবে পদ্মনাভন বলে কারও কার্ড আছে কি না?

সুদীশকে বললাম, "ডঃ জীমূতবাহনের খোঁজ কি তুই শুরু করেছিস?"

"কী করে করব বল তো? কলকাতায় আশি-নব্বই লাখ লোকের বাস। এর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করা সোজা? এ তো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা। কোত্থেকে শুরু করব ভেবেই পাচ্ছি না।"

সত্যিই কাজটা কঠিন। বললাম, "ডঃ জীমূতবাহন সম্পর্কে আর কোনও তথ্য তোর জানা আছে?"

"ভদ্রলোক বস্টন ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘদিন পড়িয়েছেন। তারপর পড়ানো ছেড়ে চলে যান শিকাগো। সেখানে কোনও একটা বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। সেই সময় আমেরিকা গভর্নমেন্টের সঙ্গে ভদ্রলোকের কী একটা প্রবলেম হয়। আমেরিকা ছেড়ে উনি চলে যান আফ্রিকায়। তারপর দীর্ঘদিন কোনও পাত্তা নেই। এই মাসছয়েক হল উনি ভারতে এসেছেন।"

"ডঃ জীমূতবাহনের বয়স কত হবে রে?"

"প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। দিল্লি থেকে ওরা একটা ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটা আমার সঙ্গে আছে। দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি।"

বুক পকেট থেকে ছবিটা বের করে সুদীশ আমার দিকে এগিয়ে দিল। পোস্টকার্ড সাইজের ছবিটা খুঁটিয়ে আমি দেখতে লাগলাম। ডঃ জীমূতবাহনের বয়স সুদীশ বলল বটে সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। ছবিতে আরও কম বলে মনে হল। অবশ্য ছবিটা কিছুদিনের পুরনোও হতে পারে। ভদ্রলোক বেশ ফরসা। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার জন্য বেশ সুখী-সুখী চেহারা। চৌকো মুখ, চোয়ালে কাঠিন্যের ছাপ। দেখেই মনে হল, ভদ্রলোক কোনও কিছুর পরোয়া করার মানুষ নন। পরনে একটা ল্যাকস্তে টি শার্ট আর বারমুডা।

মিনিস্ট্রির কর্তারা কোত্থেকে ছবিটা পেয়েছেন, তা বোঝার চেষ্টা করলাম। এসব ছবি সাধারণত লোকের ব্যক্তিগত অ্যালবামে থাকে। সেখান থেকে নেওয়া হতে পারে। কিন্তু একটু নজর করতেই বুঝতে পারলাম, না... ছবিটা কোনও বই বা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেখান থেকে কপি করা হয়েছে। ছবিটার একপাশে খুব ছোট করে লেখা আছে, 'দ্য সায়েন্টিফিক জার্নাল অব আমেরিকা'।

তা হলে একটা ক্লু পাওয়া গেল। আমেরিকার ওই জার্নালে ই-মেল করলে নিশ্চয়ই ডঃ জীমূতবাহন সম্পর্কে কিছু-না-কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। সুদীশের এই সূত্রটা নজর করা উচিত ছিল। ওকে জার্নালের কথাটা বলতে পারতাম। কিন্তু কিছু বললাম না। ছবিটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "কলকাতার বড়-বড় হোটেলগুলোতে খবর নিয়েছিস?"

"ওখানে কোথাও যদি উনি উঠে থাকেন..."

সুদীশ বলল, "সে চেষ্টাও করেছি। কোনও হদিস পাইনি। আমার মনে হয় না, উনি কোনও হোটেলে থাকবেন। হোটেলে থাকাটা ওঁর পক্ষে নিরাপদ না। আর যদি থাকেনও, তা হলে আসল নামে থাকবেন না।"

"ভদ্রলোকের জানাশুনো কেউ এখানে নেই? এমন কেউ, যিনি টিপ্‌স দিতে পারেন বা ওঁর সম্পর্কে জানেন?"

"সে খোঁজ করিনি ভাবছিস? উনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ওঁর ক্লাসমেট-এর নাম পাঠিয়েছিলেন মিঃ পদ্মনাভন। ডঃ হিরণ্ময় বাগচি। কাল সারাটা দিন খোঁজ করে তাঁর বাড়ি পৌঁছেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, সেই ভদ্রলোক দু'মাস আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ওঁর ছেলেরা বলল, ডঃ জীমূতবাহনের সঙ্গে হিরণ্ময় বাগচির ইদানীং কোনও সম্পর্ক ছিল না। বছরচারেক আগে কী একটা কারণে যেন দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল।"

হিরণ্ময় বাগচি নামটা আমার শোনা-শোনা লাগছিল। ভদ্রলোকের লেখা একটা বই, মনে হল, আমি পড়েছি। স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে আমি ভাবতে লাগলাম। একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ে

গেল। হ্যাঁ, বইটা বইমেলা থেকে কিনে এনেছিল ফুল্লরাই। পৌরাণিক অভিধান। ভদ্রলোক বাংলা পড়াতেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু খুব আগ্রহী ছিলেন পুরাণ সম্পর্কে। মাঝেমধ্যেই পুজো সংখ্যায় পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে ওঁর লেখাও দেখেছি।

ব্রেকফাস্ট করে সুদীশকে নিয়ে ফের ড্রয়িংরুমে এসে বসলাম। নাহ্, একটা সমস্যা বটে ডঃ জীমূতবাহনকে খুঁজে বের করা। ভদ্রলোক উঁচুদরের বায়োলজিস্ট। পরমাণুবিদ তো নন। পরমাণুবিদ হলে না হয় বুঝতে পারতাম, আমাদের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওঁর জন্য এত উতলা কেন? একজন বায়োলজিস্টকে নিয়ে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এত মাথাব্যথার কারণটা কী, তা ঠিক মেলাতে পারলাম না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম। হাতে মাত্র দু'দিন সময়। এর মধ্যে ডঃ জীমূতবাহনকে যদি সুদীশ খুঁজে বের করতে না পারে, তা হলে ওর কেরিয়ারে একটা কালো দাগ পড়ে যাবে। নাহ্, এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে আমাকে।

সুদীশের কাছ থেকে হিরন্ময় বাগচির বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা টুকে নিলাম। ঠিকানাটা সিরিটি অঞ্চলের। তার মানে আমাদের গল্‌ফ গ্রিন থেকে খুব বেশি দূরে না। কেন জানি না, আমার মনে হল, হিরন্ময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে ফের একবার ভাল করে কথাবার্তা বললে কোনও-না-কোনও সূত্র পাওয়া যাবেই। জীমূতবাহনের কোনও চিঠি বা ফোন নম্বর। অথবা অন্য কোনও লোকের যোগসূত্র। এমন নামকরা একটা লোক, তাঁকে কলকাতার বিজ্ঞানী মহলে কেউ-না-কেউ চিনবেনই। এসব ভেবে নিয়ে সুদীশকে বললাম, "তুই ঠাণ্ডা মাথায় ভাব। ভদ্রলোককে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় তুই একবার আমাদের অফিসের দিকে আয়। তখন ফের আলোচনায় বসা যাবে।"

"তুই কি এখন কোথাও বেরোবি?"

"হ্যাঁ। কুঁদঘাটের দিকে যাব। ফিরে এসে চানটান করে তার পর অফিস।"

"তা হলে আমি উঠি। বিকেলে তোকে একবার মোবাইলে ধরে নেব।"

সোফা ছেড়ে দু'জনে উঠে পড়লাম। দরজা খুলতে যাব এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল। এসময় আবার কে এল? দরজা খুলে দেখি, সঞ্জয়। ফুল্লরার দূর সম্পর্কের ভাই। উদভ্রান্তের মতো চেহারা। আমাকে দেখেই ও হাউমাউ করে উঠল, "কালকেতুদা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

॥ দুই ॥

সঞ্জয়কে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে বসালাম। এই দিনদশেক আগে ও আমাদের এখানে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে গেছিল। ফুল্লরার থেকে সাত-আট বছরের ছোট। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। এখনও বিয়ে করেনি। বিধবা মায়ের সঙ্গে সঞ্জয় থাকে পিয়ারলেস হসপিটালের পিছনে পঞ্চসায়র বলে একটা জায়গায়। ওর বাবা চাকরি করতেন ইনকাম ট্যাক্সে। অফিসের কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফত ওখানে চার-পাঁচ কাঠার মতো জমি কিনেছিলেন। ছোট একটা বাড়ি রেখে গেছেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর বেশ কিছুদিন সঞ্জয় বেকার বসেছিল। নানা জায়গায় চেষ্টা করেও চাকরি পাচ্ছিল না। তারপর কী খেয়াল হল, একদিন এসে বলল, চাকরির চেষ্টা আর করবে না। ছোটখাটো ব্যবসা করবে।

আমি উৎসাহ দিয়েছিলাম। ও নিজেই ঠিক করল, পোলট্রি খুলবে। কোত্থেকে যেন মাসছয়েক ট্রেনিং নিয়ে এল। তারপর বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় একটা শেড করে পোলট্রি চালু করে দিল। সেই সময় ব্যাঙ্ক থেকে লাখখানেক টাকা ও লোন নিয়েছিল। আমিই বলেকয়ে লোনটা পাইয়ে দিয়েছিলাম। সঞ্জয় খুব উদ্যমী ছেলে। বছর দেড়েকের মধ্যেই ব্যবসাটা জমিয়ে তুলেছে। পঞ্চসায়র অঞ্চলে নতুন বসতি হয়েছে। ইদানীং প্রচুর মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ ওখানে বসবাস শুরু করেছেন। তাই সঞ্জয়ের চিকেন-এর ব্যবসা ভালই চলছিল।

হঠাৎ কী সর্বনাশ হল ওর, বুঝতে পারলাম না। তা হলে কি ওর মায়ের কিছু হয়েছে? সোফায় বসিয়ে ওকে প্রশ্নটা করতেই সঞ্জয় বলল, "না কালকেতুদা, মা ভাল আছে। আমার ব্যবসাটা... লাটে উঠে গেল।"

সুদীশ চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে। ইশারায় ওকে যেতে আমি নিষেধ করলাম। পঞ্চসায়রের দিকটায় এই কিছুদিন আগে ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে। এক রাতে পর পর চোদ্দটা বাড়িতে। থানা দূরে নয়। দু'-আড়াই কিলোমিটারের মধ্যে। তবুও কেউ খবর দিতে পারেনি। সেরকম কিছু হয়েছে হয়তো। তাই সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যবসা লাটে উঠেছে মানে? ডাকাতি, না অন্য কিছু?"

"না, ঠিক ডাকাতি নয়। তার চেয়েও ভয়ানক। বললে তুমি বিশ্বাসই করতে চাইবে না। একটা রাক্ষস...কাল রাতে আমার পোলট্রির মধ্যে ঢুকে সব ছিন্নভিন্ন করে গেছে। আমি শেষ হয়ে গেলাম কালকেতুদা।"

রাক্ষস? আমি বুঝতেই পারলাম না, সঞ্জয় কী বলছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে রাক্ষস আসবে কোত্থেকে? সঞ্জয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? সুদীশ কৌতূহলী মুখে সোফায় এসে বসেছে। একবার আমার, আর-একবার সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আমি এবার কড়া গলায় বললাম, "এই, ভাল করে খুলে বল তো, তোর পোলট্রিতে ঠিক কী হয়েছে।"

আমাকে বিরক্ত হতে দেখে সঞ্জয় নিজেকে কিছুটা সামলে নিল। তারপর বলল, "কয়েকদিন ধরেই আমাদের ওখানে একটা নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। বাড়ির পোষা পাখি, কুকুর, বেড়াল কখনও হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। কখনও অর্ধেক খাওয়া অবস্থায় বাড়ির সামনে পড়ে থাকছিল। সে-দৃশ্য দেখলে তুমি স্থির থাকতে পারতে না। সব ঘটনাই ঘটছিল রাতের দিকে। আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কে এসব ঘটাচ্ছে। কানাঘুষো শুনছিলাম, নেকড়ে জাতীয় একটা প্রাণী রাতের দিকে উদয় হচ্ছে। আসছে পেছনদিককার গ্রাম থেকে। সে-ই নাকি যত নষ্টের মূল।"

"বেশ, তারপর?"

"আমাদের ওখানে একটা নাইট পার্টি আছে। ওরা এসে একদিন আমাকে বলল, 'সঞ্জয়, অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোর পোলট্রিতে যে-কোনওদিন অ্যাটাক হতে পারে। পোলট্রির খাঁচা যাতে ভালমতো বন্ধ থাকে, তার একটা ব্যবস্থা কর। এখন বিয়ের সিজন। বড়-বড় অর্ডার পাওয়ার সময়। তাই নাইট পার্টির লোকেদের কথা শুনে মনে বেশ ভয় ধরে গেছিল। মিস্তিরি নিয়ে এসে আমি আরও একপ্রস্থ জাল লাগিয়ে নিলাম। সেইসঙ্গে বড় তালাও। অনেক রাত অবধি লোহার রড নিয়ে ছাদের উপর আমি বসে থাকতাম। বেচাল কিছু দেখলেই হাঁক মারব, যাতে নাইট পার্টির লোকজন চট করে চলে আসতে পারে। কিন্তু এত সাবধান হয়েও কিছু করতে পারলাম না। কাল রাতে চোখের সামনে রাক্ষসটা সব ধ্বংস করে গেল।" নাগাড়ে কথাগুলো বলেই সঞ্জয় এবার কেঁদে ফেলল।

মুশকিল। একটা ইয়ং ছেলে, এমন আবেগপ্রবণ হবে কেন? ফের কড়া গলায় বললাম, "চোখের সামনে? তার মানে?"

"শেষ রাতের দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ হুটোপাটির আওয়াজ। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, কিম্ভূতকিমাকার দেখতে একটা লোক পোলট্রির ভেতর ঢুকে মুরগির গলা ছিঁড়ে রক্ত খাচ্ছে। উফ্, সে দৃশ্য দেখলে তুমি সহ্য করতে পারতে না কালকেতুদা। কী বীভৎস! প্রথমে ভাবলাম, ভূতটুত হবে। একটু নজর করতে দেখি, না... জ্যান্ত... রাক্ষস টাইপের।"

"লোকটা ভেতরে ঢুকল কী করে?"

"জাল ছিঁড়ে। আমি একবার চিৎকার করে উঠতেই রাক্ষসটা আমার দিকে ঘুরে তাকাল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি জানলাটা বন্ধ করে দিই।"

চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছিল, কথাটা শুনে চট করে আমার গাজিয়াবাদের নরদানবের কথা মনে পড়ে গেল। সেন্টার টেবিলের উপর 'দ্য টেলিগ্রাফ' কাগজটা পড়ে আছে। সেটা তুলে ভেতরের পাতায় নরদানবের ছবিটা দেখাতেই সঞ্জয় বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ কালকেতুদা। রাক্ষসটা ঠিক এইরকমই দেখতে। গায়ে লোম, হাতে বড়-বড় নখ। হাইট পাঁচ ফুটের কম।"

"তারপর কী হল হল।"

"ভয়ে আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছিলাম। কিছুক্ষণ পর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে জানলাটা খুলতেই দেখি কেউ নেই। আমার পোলট্রি একেবারে ফাঁকা। তুমি একবার যাবে আমাদের বাড়িতে? মা বারবার করে আমায় বলে দিয়েছে, যে করেই হোক তুই কালকেতুকে ধরে আনবি।"

আমার বাড়ি থেকে পঞ্চসায়র যেতে-আসতে কম করে এক-সোয়া-এক ঘণ্টা। তার উপর পুরো ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখতে আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে। তার মানে আজ বেলা চারটের আগে আর অফিসে যাওয়া হবে না। অফিসে সন্তোষবাবুকে ফোনে বলে দিলে অবশ্য অসুবিধে নেই। উনি কাজ এগিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সঞ্জয়ের সঙ্গে ওদের বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বেলা এগারোটার মধ্যে আমাকে একবার কুঁদঘাটের দিকে যেতেই হবে। ওখানে আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

সুদীশ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। আমি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই ও বলল, "পুলিশে খবর দিয়েছ ভাই?"

"জানি না। নাইট পার্টির লোকেরা নিশ্চয়ই ফের খবর দিয়েছে। আগে একবার খবর দিয়েছিল। পুলিশ এল। সব শুনে আমাদেরই ধমক দিয়ে চলে গেল। বলল, 'গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে ফের যদি আমাদের হ্যারাস করেন, তা হলে ধরে নিয়ে যাব।'"

এই উত্তরটাই পুলিশের কাছে আশা করেছিলাম। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত পুরো পরিস্থিতিটা ভেবে নিলাম। পাঁচ-সাত দিন আগে গাজিয়াবাদে যে ঘটনা ঘটে গেছে, প্রায় সেরকমই ঘটনা পঞ্চসায়রে ঘটছে। দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই তো?

গাজিয়াবাদের ব্যাপারটা কাগজে পড়ে মনে হয়েছিল, মাফিয়াদের কোনও স্বার্থ আছে। কিন্তু পঞ্চসায়রে তো মাফিয়াদের কোনও অস্তিত্বই নেই। ওখানেও একই রকম দেখতে নরদানব! এর পিছনে রহস্যটা কী? মাথা ঘামিয়ে সমাধান করতে পারলে মন্দ হয় না। কেসটা হাতে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলতেই সঞ্জয়কে বললাম, "তুই এখন বাড়ি যা। আমি আজই বিকেলের দিকে তোদের ওখানে ঘুরে আসব। মাসিমাকে বলিস, যেন চিন্তা না করেন।"

মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই আমরা তিনজন নীচে নেমে এলাম। সঞ্জয় মোপেডে করে গড়িয়ার দিকে চলে গেল। সুদীশ জিপে করে রওনা দিল বেলভেডিয়ারের দিকে। আর আমি গাড়ি স্টার্ট দিলাম কুঁদঘাটের দিকে। সঞ্জয়ের জন্য খারাপ লাগল। বেচারির হয়তো টাকা পয়সার দরকার ছিল। জিজ্ঞেস করলে ভাল হত। ফুল্লরা থাকলে নিশ্চয়ই কথাটা ওকে জিজ্ঞেস করত। সঞ্জয় যা বলল, তাতে মনে হয়, ওর কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। টাকাটা ওর মতো ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে কম নয়। দেখি, বিকেলবেলার দিকে ওদের বাড়ি গেলে কায়দা করে ওর প্রয়োজনটা জেনে নিতে হবে। এই সময়টায় আমার ওকে সাহায্য করা উচিত।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎই মনে হল, সঞ্জয়দের ওখানকার এই খবরটা আমাদের কাগজে ছাপানো দরকার। তা হলে পুলিশ একটু নড়েচড়ে বসবে। দিন পাঁচ-সাত হল, ওদের ওখানে কয়েকটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কোনও কাগজে একটা লাইনও বেরোয়নি, এটাও অদ্ভুত। আমাদের কাগজেরই রিপোর্টার সুপর্ণ পাঠক ওই পঞ্চসায়রে থাকে। সে কি কিছুই শোনেনি? পরক্ষণেই মনে পড়ল, সুপর্ণ এখন কলকাতাতে নেই। হংকং গেছে কমনওয়েলথ্ সম্মেলনে। ও থাকলে নিশ্চয়ই অফিসে এসে বলত আমাদের।

কুঁদঘাটের মোড়ে এসে দেখলাম, বিরাট জ্যাম। কোনও গাড়ি বাঁ দিক দিয়ে যেতে দিচ্ছে না। পুলিশ গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে ডান দিকে। অর্থাৎ সিরিটির দিকে। জানলায় মুখ বাড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কুঁদঘাটে কী হয়েছে ভাই?"

লোকটা বলল, "ভন্টদা খুন হয়েছে। তাই পথ অবরোধ চলছে।"

শুনে বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে গেল। কলকাতার হলটা কী? রোজ কেউ-না-কেউ খুন হবে। ব্যস, তারপর রাস্তা আটকে বসে পড়বে একদল লোক। অপরাধীকে গ্রেফতার করার দাবিতে। কখন পুলিশ আসবে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে, তার জন্য আমার অপেক্ষা করে লাভ নেই। তাই ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। সিরিটির দিকের রাস্তাঘাট ভাল করে চিনি না। একটা রাস্তা আছে জানি, যায় মহাবীরতলার দিকে। সেখান থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি খুব কাছেই। ফালতু এত বড় একটা চক্কর মেরে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। কুঁদঘাটের ভন্টাদা খুন হওয়ার আর দিন পেল না!

সিরিটির দিকে গাড়ি ঘোরাতেই মনে পড়ল, হিরন্ময় বাগচির বাড়ি তো এই অঞ্চলেই। হাতে যখন খানিকক্ষণ সময় আছে, তখন ভদ্রলোকের বাড়ি একবার ঘুরে গেলে কেমন হয়? বেলা পৌনে এগারোটা। হিরন্ময়বাবুর ছেলেরা অবশ্য কেউ বাড়িতে থাকবেন না। নিশ্চয়ই তাঁরা চাকরি করেন। তবুও বাড়িতে ওঁর স্ত্রী অথবা অন্য কেউ তো থাকবেন। একবার ঢুঁ মারতে দোষ কী? কথাটা মনে হওয়া মাত্রই পকেট থেকে হিরন্ময়বাবুর ঠিকানাটা বের করলাম। সাতের বি, নেতাজি সুভাষ রোড। ডানদিকে একটা মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা 'তেরো, নেতাজি সুভাষ রোড'। তার মানে হিরন্ময়বাবুর বাড়ি এই কাছেপিঠে কোথাও হবে। বাঁ দিকের গলিতে গাড়িটা পার্ক করে আমি নেমে পড়লাম।

"কালকেতুদা, আপনি আমাদের পাড়ায়!"

নিজের নামটা শুনে ঘুরে তাকালাম। দেখি, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী একটা ছেলে হাসিমুখে একটা বাড়ির রক থেকে নেমে এল। প্রায় ছ' ফুট লম্বা। দেখেই মনে হল, খেলাধুলো করে এবং বেশ ভাল পরিবারের ছেলে। আমার দিকে এগিয়ে এসে ও বলল, "কার বাড়িতে যাবেন কালকেতুদা?"

বললাম, "আমাকে তুমি চেনো?"

"আপনার মতো রিপোর্টারকে কে না চেনে বলুন? আপনি ছাড়া তো আমাদের টিম নিয়ে আর কেউ লেখে না।"

তার মানে...নিয়মিত ময়দানে যাওয়া ছেলে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না, ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগানের সাপোর্টার। দুই ক্লাবের লোকেদের কাছে প্রায়ই এই কথাটা শুনি। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য তাই বললাম, "সাতেরর বি, বাড়িটা কোথায় বলো তো?"

"আরে, ওটা তো আমাদেরই বাড়ি। কার কাছে যাবেন?"

"হিরন্ময়বাবু তোমার কে হন?"

"দাদু। কিন্তু উনি তো..."

"জানি, মারা গেছেন। আসলে দরকারটা আমার হিরন্ময়বাবুর সঙ্গে নয়। তোমাদের যে-কোনও একজনের সাহায্য পেলে চলবে।"

"ওঃ, এইবার বুঝেছি, আপনি কী কারণে এসেছেন। কালই সুদীশ নাগ বলে একজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। ভট্চাজদাদু সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন।"

বললাম, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। তুমি কি তাঁকে কখনও দেখেছ?"

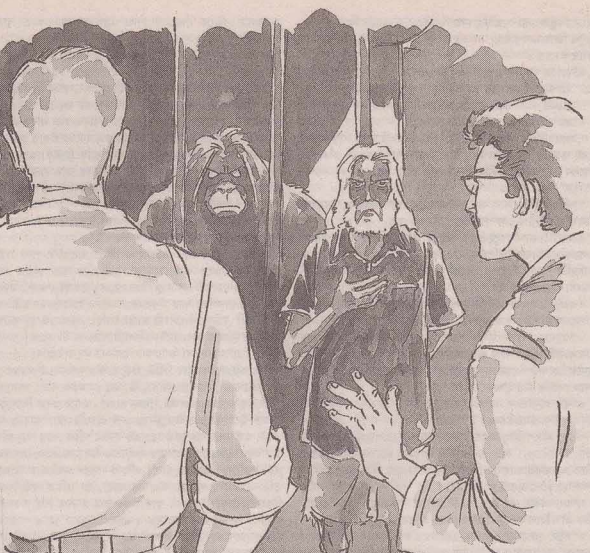

"বারদুয়েক। শেষবার উনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে চলে আসার পর। সে যাক, আগে আমাদের বাড়িতে চলুন। তারপর না হয় ওঁর সম্পর্কে কথা বলা যাবে। আজ বাবাও বাড়িতে আছেন।"

কয়েক পা হাঁটার ফাঁকেই জেনে গেলাম, ছেলেটার নাম কৌশিক। এভাররেডি ক্লাবে ফুটবল খেলে। এ-বছর মহমেডান স্পোর্টিং থেকে ডাক পেয়েছিল। কিন্তু ওর বাবা বড় ক্লাবে যোগ দিতে দেননি। কৌশিক এখন আই পি এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওর দাদু... মানে হিরন্ময়বাবুর খুব ইচ্ছে ছিল কৌশিক বড় পুলিশ অফিসার হোক। বাড়ির গেটে পৌঁছে ছেলেটা বলল, "কালকেতুদা, আমি জানি, আপনি তো শখের গোয়েন্দাগিরি করেন। আমাকে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে নেবেন?"

কোনও উত্তর না দিয়ে আমি হাসলাম।

কৌশিক যতটা আগ্রহ দেখাল, ওর বাবা পার্থপ্রতিমবাবু কিন্তু ততটা দেখালেন না। ভদ্রলোক সরকারি অফিসার। কথাবার্তায় খুবই সংযত। ডঃ জীমূতবাহনের কথা তুলতেই উনি খুব ভদ্রভাবে বললেন, "ওঁর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। ইদানীং বাবার সঙ্গে উনি কোনও যোগাযোগ রাখতেন না।"

শুরুতেই বুঝে গেলাম, ভদ্রলোক মুখ খুলবেন না। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারালে চলবে না। কথা বলে যেতে হবে। কথা বলতে বলতে কোনও-না-কোনও সময় পার্থপ্রতিমবাবু বেফাঁস কিছু বলে ফেলবেন। সেই লাইন ধরে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। বললাম, "কৌশিক বলল, ডঃ ভট্টাচার্য নাকি আপনাদের এই সিরিটির বাড়িতে বারদুয়েক এসেছিলেন।"

পার্থপ্রতিমবাবু পরিষ্কার অস্বীকার করলেন, "না, উনি এ-বাড়িতে আসেননি। কৌশিক বাচ্চা ছেলে। কী বলতে কী বলেছে, সেটা ধরবেন না।"

"ডঃ ভট্টাচার্য আমেরিকায় কী নিয়ে রিসার্চ করেছেন, জানেন?"

"না, আমি ঠিক জানি না।"

কৌশিকের দিকে চোখ যেতেই বুঝতে পারলাম, ও খুব অস্বস্তি বোধ করছে। বাবার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর তখনই আমার মনে হল, ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে হিরন্ময়বাবুর

এমন কিছু সমস্যা হয়েছিল, যা পার্থপ্রতিমবাবু জানতে দিতে চান না। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, "ডঃ ভট্টাচার্যের কোনও ছবি বা চিঠি আপনার কাছে আছে?"

"বলতে পারব না। খুঁজে দেখতে হবে।"

"আপনার বাবার সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের বন্ধুত্বটা কতদিনের?"

"শুনেছি, ওঁরা একই ইয়ারে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন।"

"ডঃ ভট্টাচার্যের ফ্যামিলিতে কেউ নেই?"

"আমেরিকায় থাকার সময় উনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু শুনেছি সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। এখানে ওঁর কেউ ছিলেন বলে শুনিনি। কিন্তু আপনি এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন জানতে পারি?"

সত্যি কথাটা বললে যদি মন গলে, সেজন্যই বললাম, "আমাদের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওঁর সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন বলে।"

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পার্থপ্রতিমবাবু। তারপর বললেন, "কাল ওয়াশিংটন থেকেও একটা ফোন এসেছিল এ-বাড়িতে। ওদের ডিফেন্স সেক্রেটারিয়েট থেকে। সত্যি বলতে কী, আমরা কনফিউজড।"

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা আপনাদের বাড়ির ফোন নম্বর পেলেন কোত্থেকে?"

"আসলে ভট্চাজ আঙ্কল আমেরিকার নাগরিক। একটা সময় ওখান থেকে উনি বাবার নামে একবার কিছু ডলার পাঠিয়েছিলেন। হয়তো ব্যাঙ্কে কোথাও আমার বাবার নাম এবং কন্ট্রাক্ট নাম্বার ছিল। মনে হয়, ব্যাঙ্ক থেকেই ওঁরা ইনফরমেশনটা পান।"

"যদি আপত্তি না থাকে তা হলে বলবেন, ফোনে ওঁরা ঠিক কী কী ইনফরমেশন চেয়েছিলেন?"

"না, খারাপ কিছু না। ভট্চাজ আঙ্কলের হোয়ারঅ্যাবাউটস ওরা জানতে চাইলেন। নাকি খুব জরুরি দরকার। কোনও একটা কারণে ওঁকে আমেরিকায় ফেরত নিয়ে যেতে চান। তো, আপনাকে এখুনি যা বললাম, ওঁদেরও তাই বলেছি।"

"আর-একটা কথা জানতে চাইছি বলে মাফ করবেন। ডঃ ভট্টাচার্য ঠিক কী কারণে আপনার বাবার কাছে ডলার পাঠিয়েছিলেন?"

"সঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয়, এখানে উনি কোথাও কয়েক বিঘা একটা জমি কিনেছিলেন। ল্যাবরেটরি করার জন্য। বাবা জমি কেনার কাজটা এখানে করে দেন। এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।"

পার্থপ্রতিমবাবু মোটামুটি আমাকে বুঝিয়েই দিলেন, কথা বাড়াতে উনি মোটেই আগ্রহী নন। সেটা বুঝেই আমি উঠে আমার নেমকার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "ডঃ ভট্টাচার্যের কোনও চিঠি বা ছবি যদি খুঁজে পান, তা হলে প্লিজ একটু যোগাযোগ করবেন।"

বাইরে বেরোবার সময় পার্থপ্রতিমবাবু আমার সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। আমাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় বললেন, "আপনাকে আমি কোনও সাহায্য করতে পারলাম না। ডোন্ট মাইন্ড, কালকেতুবাবু।"

মনে-মনে একটু বিরক্ত হলেও তা চেপে রেখে বললাম, "নট অ্যাট অল।"

গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ামাত্রই দেখি কৌশিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হাতে ছোট একটা প্যাকেট। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বলল, "এই নিন। এর ভেতর ভট্চাজদাদুর অনেক চিঠি আছে। মনে হয়, আপনার কাজে লাগবে।"

বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

গাড়িটা স্টার্ট দিতে যাচ্ছি, এমন সময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কৌশিক ফের বলল, "বাবার কাছে আপনি তখন জানতে চাইলেন, ভট্চাজদাদু কী নিয়ে রিসার্চ করেছেন। আমি বলে দিচ্ছি। রক্তবীজ।"

বলেই কৌশিক পিছু হাঁটা দিল। রক্তবীজ? আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

॥ তিন ॥

বাড়ি ফিরেই ইন্টারনেট খুলে আমি প্রথমে সায়েন্টিফিক জার্নাল অব আমেরিকায় একটা ই-মেল পাঠালাম। এই অনুরোধ করে, "যদি আপনাদের কাছে ডঃ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকে তা হলে দয়া করে জানান। শিকাগোর সঙ্গে আমাদের সময়ের তফাত প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টার। তার মানে, ওখানে এখন রাত সাড়ে তিনটে। ওখান থেকে যদি কোনও উত্তর আসে, তা হলে আমাদের সন্ধে সাতটার আগে আসবেন না। অফিস থেকে ফিরে আসার পর মেল চেক করতে হবে। আজ রাত আটটার সময় লন্ডন পাব-এ জুহি চাওলা আর শাহরুখ খানের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা। ইন্টারভিউ নেব। তার মানে রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারব না।"

সেন্টার টেবিলে ডঃ ভট্টাচার্যের চিঠির প্যাকেটটা পড়ে আছে। হাতে সময় আছে বলে ভাবলাম, চিঠিগুলো পড়ে নেওয়া যাক। কোথাও-না-কোথাও একটা ক্লু পাওয়া যাবে। প্যাকেট থেকে চিঠিগুলো বের করে দেখলাম, সময় অনুসারে সাজানো রয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের প্রথম চিঠি উনিশশো চৌষট্টি সালে লেখা। সে-বছরই ডঃ ভট্টাচার্য বস্টনে যান। আর শেষ চিঠিটা উনি পাঠিয়েছিলেন উনিশশো নিরানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে। আফ্রিকার বারকিনা ফাসো থেকে।

ডঃ ভট্টাচার্যের প্রথম চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। হিরণ্ময়বাবুকে উনি লিখেছেন, "এখানে আসার উদ্দেশ্য তোমাকে বলি। বছরদুয়েক আগে তুমি কোনও একটা পুজো সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলে, পুরাণে উল্লেখিত রক্তবীজ নিয়ে। সেই প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবনার উদয় হয়। রক্তবীজের শরীর থেকে পড়া প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা রক্তবীজ জন্ম নিচ্ছে, দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে পড়ছে, এটা কি সম্ভব? একদিন কথায়-কথায় তুমি বলেছিলে, পুরাণে যা লেখা আছে, তা কল্পিত কাহিনী নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানের যুগে এখন তার অনেক কিছু সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন ব্যোমযান। মানে এখনকার যুগের এরোপ্লেন। আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, তোমার ধারণাই ঠিক। আমি বায়োলজির ছাত্র। আমার লাইনে রক্তবীজ নিয়ে রিসার্চ করার কথা সিরিয়াসলি ভাবছি। তুমি দেখে নিও, আমি একদিন-না-একদিন এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করবই এবং সেটা মানুষের মঙ্গলের জন্য।"

ডঃ ভট্টাচার্যের চিঠিটা পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। এও সম্ভব? রক্তবীজ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই আবছা। ছেলেবেলায় কোথাও পড়েছিলাম। হঠাৎই মনে পড়ল, বইমেলা থেকে কিছুদিন আগে ফুল্লরা একটা বই কিনে এনেছিল—হিরণ্ময় বাগচির পৌরাণিক অভিধান। সেখানে নিশ্চয়ই রক্তবীজ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। উঠে গিয়ে শেল্ফ থেকে সেই বইটা নিয়ে এলাম। রক্তবীজ কে, আগে বিস্তৃতভাবে তা জেনে নেওয়া দরকার।

অভিধান থেকে খুঁজে বের করলাম, রক্তবীজ প্রসঙ্গ। দেবী ভাগবত পুরাণে এই রক্তবীজ সম্পর্কে লেখা আছে, "দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষরা তার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতায় আরোহণ করেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ হওয়ার পর স্ত্রীর কুক্ষিপ্রদেশ ভেদ করে মহিষাসুর নির্গত হন। পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে রম্ভও তখন রূপান্তর গ্রহণ করে চিতা থেকে উত্থিত হন। রূপান্তরিত এই রম্ভই 'রক্তবীজ' নামে খ্যাত।"

রক্তবীজের জন্মবৃত্তান্ত মোটেই আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। ডঃ ভট্টাচার্যের মতো একজন নামী বায়োলজিস্ট কী করে এর পিছনে বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে পেলেন তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগল।

পৌরাণিক অভিধানে এর পর লেখা আছে, "রক্তবীজ দৈত্যরাজ শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধকালে এই রক্তবীজ ও দেবীর সহচরীদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রক্তবীজের দেহ থেকে নির্গত প্রতিটি রক্তবিন্দু ভূমি স্পর্শ করা মাত্র তা থেকে রক্তবীজের মতোই বলবীর্য সম্বলিত আর-একটি রক্তবীজ উদ্ভূত হতে থাকে। রক্তবীজ এই বর প্যেছিলেন শিবের কাছ থেকে।

"ইন্দ্র বজ্র দিয়ে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে দেবী মহাশক্তি দেবতাদের সমূহ বিপদ দেখে নিজের অঙ্গীভূতা কালী ও চামুণ্ডাকে বলেন সমস্ত রক্তবীজস্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ করতে। কালী ও চামুণ্ডা তাঁদের রসনা বিস্তার করে রক্তবীজের শোণিত পান করতে থাকেন। এইভাবে দেবী মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্তবীজ নিপাত করেন।"

পুরাণের এই অবান্তর কাহিনী পড়ে ডঃ ভট্টাচার্যের মতো একজন বিজ্ঞানী উদ্বুদ্ধ হবেন এবং রক্তবীজও আবিষ্কার করে ফেলবেন, এটা সত্যিই বিশ্বাস করতে আমার মন চাইল না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। তবুও, সাধারণ জ্ঞান সম্বল করেও তো আন্দাজ করা যায়! যে-কোনও প্রাণীর জন্মের জন্য একটা গর্ভের প্রয়োজন। রক্তবীজের রক্তবিন্দু ভূমি স্পর্শ করছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি রক্তবীজ উৎপন্ন হচ্ছে, এ তো অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। নাহ্, আগে অন্য চিঠিগুলো পড়ে ফেলি, তারপর বিচার করতে বসব, ডঃ ভট্টাচার্য কোন সত্যের মনোযোগী।

ভদ্রলোকের প্রায় প্রতিটা চিঠিতেই রক্তবীজের উল্লেখ আছে। সত্তর সালের গোড়ার দিকে একটা চিঠিতে উনি হিরণ্ময়বাবুকে লিখেছেন, "ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে আমি উৎসাহ পাব। কিন্তু প্রতিবারই তুমি আমাকে নিরাশ করছ। তুমি লিখেছ, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সেই সৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা ঠিক হবে না। আমি একটু অবাক হচ্ছি তোমার পরামর্শে। ঈশ্বরের কথা ভেবে হাত গুটিয়ে থাকলে কিন্তু বিজ্ঞান এগোবে না। আমি তোমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আর কয়েক বছরের মধ্যেই এমন একটা দিন আসবে, যেদিন একটা প্রাণীর কোষ থেকে আর-একটি প্রাণী আমাদের মতো কোনও বিজ্ঞানীই তৈরি করবে। এর জন্য ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।"

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে ডঃ ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমার মনোভাব বদলাতে শুরু করল। যাঁরা জিনিয়াস, তাঁরা সময়ের অনেক আগেই অনেক কিছু ভাবতে পারেন। সত্তর সালেই ডঃ ভট্টাচার্য ক্লোনিংয়ের কথা ভেবেছিলেন। দ্রুত সব চিঠিগুলো পড়ে ফেললাম। সব মিলিয়ে পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এল।

১. ডঃ ভট্টাচার্য নিজের দেহের কোষ থেকে তাঁরই একজন ক্লোন তৈরি করতে সফল হয়েছেন। বিশ্বের প্রথম মানুষের ক্লোন। তার নামও রেখেছেন জীমূতবাহন। সেই ক্লোন গোপনে প্রতিপালিত হয়েছে এক মেক্সিকান দম্পতির কাছে। তবুও খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে আমেরিকায়। এই ক্লোন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ রক্তবীজ আবিষ্কারের প্রথম ধাপ। হিসাব করে দেখলাম, ডঃ ভট্টাচার্যের দাবি যদি সত্যি হয়, তা হলে সেই ক্লোনের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ।

২. ক্লোন আবিষ্কারের পর বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংস্থা ডঃ ভট্টাচার্যের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, ফর্মুলাটা তারা কিনতে আগ্রহী। এক বিলিয়ন ডলার দিতেও তারা রাজি। এই খবরটি শুনে কলকাতা থেকে হিরণ্ময়বাবু প্রচণ্ড উষ্মা প্রকাশ করেছেন। চিঠি ও পালটা চিঠিতে দু'জনের মধ্যে তীব্র মন কষাকষি হয়েছিল। হিরণ্ময়বাবু আশঙ্কা করেছিলেন, একদিন-না-একদিন ডলারের লোভ ডঃ ভট্টাচার্যের পক্ষে সম্বরণ করা সম্ভব হবে না। তাতে মারাত্মক অসন্তুষ্ট হয়েছেন ডঃ ভট্টাচার্য।

৩. উনআশি সালের শেষ দিকে শরীর খারাপ হয়েছিল ডঃ ভট্টাচার্যের। সে সময় তিনি দু'মাসের জন্য ভারতে আসেন। তখনই গাজিয়াবাদের এক শিল্পপতি বিশ্বনাথ দ্বিবেদীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দ্বিবেদীর মধ্যে একজন প্রকৃত বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলেন ডঃ ভট্টাচার্য। একদিন গল্প করার সময় ক্লোন তৈরি করার কথাটা তিনি বলে ফেলেন। শুনে দ্বিবেদী পরামর্শ দেন, গাজিয়াবাদে তাঁর বিশাল জায়গা-জমি আছে। সেখানে বিঘ্ন করলে ডঃ ভট্টাচার্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে পারেন। দু'জনে মিলে মানুষের অসীম উপকারও করবেন। এই যে পৃথিবীতে এত যুদ্ধ হচ্ছে এবং এত দক্ষ মানুষ যুদ্ধে মারা যাচ্ছে, তা বন্ধ করা সম্ভব হবে, যদি ল্যাবরেটরিতে প্রচুর সংখ্যক ক্লোন তৈরি করে যুদ্ধরত দেশগুলোকে সাপ্লাই করা যায়। তা হলে যুদ্ধে আসল মানুষ আর মরবে না। সভ্য দেশগুলো ধন্য ধন্য করবে।

৪. রক্তবীজ নিয়ে ডঃ ভট্টাচার্যের রিসার্চ হিরণ্ময়বাবু পছন্দ করছিলেন না। তিনি লিখেও ছিলেন, রিসার্চ সফল হলে পৃথিবীর সমূহ বিপদ। একজন রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই আর-একজন রক্তবীজ জন্ম নেবে। তাই যদি হয়, তা হলে সারা পৃথিবী ভরে যাবে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে। একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। হিরণ্ময়বাবুর সাবধানবাণীতে গুরুত্ব দেননি ডঃ ভট্টাচার্য। তাই হিরণ্ময়বাবু শেষে পরিষ্কারই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চান না।

৫. চূড়ান্ত মনোমালিন্য হওয়ার আগে হিরণ্ময়বাবু মারফত ডঃ ভট্টাচার্য এখানে একটা জমি কিনেছিলেন। সেটা ইস্টার্ন বাইপাসের আরও পূর্ব দিকে, পঞ্চসায়রের ও পিছনে। ওদিকটায় আগে কোনও জনবসতি ছিল না। আর ওইরকম নির্জন জায়গাই কলকাতার কাছাকাছি খুঁজছিলেন ডঃ ভট্টাচার্য। সেজন্য হিরণ্ময়বাবুকে উনি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। পরে ব্যাঙ্ক মারফত ডলার পাঠিয়েছেন ওই জায়গায় বাড়ি করার জন্য।

সবগুলো চিঠি পড়ার পরই আমি চোখ বুজে ভাবতে বসলাম, পাঁচটা তথ্য থেকে এই মুহূর্তে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যটা হল ডঃ জীমূতবাহন ভট্টাচার্য এখানে, পঞ্চসায়রে বাড়ি করেছেন। এবং এই বাড়ির কথা হিরণ্ময়বাবুর পরিবার ছাড়া আর কেউ জানেন না। তা হলে কি উনি এখন পঞ্চসায়রেই আছেন? হতে পারে। একমাত্র ওখানেই নিজেকে আড়ালে রাখা ডঃ ভট্টাচার্যের পক্ষে সম্ভব। সুদীশ শত চেষ্টা করলেও ওঁকে খুঁজে পাবে না।

দুইয়ে দুইয়ে চার করতে লাগলাম। গাজিয়াবাদ আর পঞ্চসায়রে একই ধরনের কিম্ভূত প্রাণী দেখা গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রাণীগুলো ডঃ ভট্টাচার্যের আবিষ্কার করা সেই রক্তবীজ। মনে হয়, ভারতে আসার পর ডঃ ভট্টাচার্য প্রথমে কিছুদিন গাজিয়াবাদে ছিলেন। ডঃ দ্বিবেদীর আতিথ্য নিয়েছিলেন। সেখানে হয়তো কোনও কারণে একটা-দুটো রক্তবীজ বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। উৎপাত শুরু করে দিয়েছিল। এ-নিয়ে কাগজে লেখালেখি হওয়ায় ডঃ ভট্টাচার্য আর কোনও ঝুঁকি নেননি। পঞ্চসায়রে চলে আসেন। কিন্তু এখানেও কোনও কারণে রক্তবীজের আটকে রাখতে পারেননি। গভীর রাতে তারা দুষ্কর্ম শুরু করে দিয়েছে।

মনে-মনে নিশ্চিত হতেই সুদীশকে মোবাইলে ফোন করলাম। ওকে এখুনি সব জানানো দরকার। কিন্তু ওদিকে রিং হচ্ছেই যাচ্ছে। কেউ তুলছে না। বারদুয়েক চেষ্টা করে ওকেনা পেয়ে মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠালাম। "যেখানেই থাকিস, আমার বাড়িতে চলে আয়। জরুরি দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের একবার পঞ্চসায়র যাওয়া দরকার।"

পঞ্চসায়র কত বড় অঞ্চল সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। একবারই ফুল্লরার সঙ্গে আমি সপ্তায়নের বাড়ি গেছিলাম। সেও রাতের

এমন কিছু সমস্যা হয়েছিল, যা পার্থপ্রতিমবাবু জানতে দিতে চান না। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, "ডঃ ভট্টাচার্যের কোনও ছবি বা চিঠি আপনার কাছে আছে?"

"বলতে পারব না। খুঁজে দেখতে হবে।"

"আপনার বাবার সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের বন্ধুত্বটা কতদিনের?"

"শুনেছি, ওঁরা একই ইয়ারে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন।"

"ডঃ ভট্টাচার্যের ফ্যামিলিতে কেউ নেই?"

"আমেরিকায় থাকার সময় উনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু শুনেছি সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। এখানে ওঁর কেউ ছিলেন বলে শুনিনি। কিন্তু আপনি এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন জানতে পারি?"

সত্যি কথাটা বললে যদি মন গলে, সেজন্যই বললাম, "আমাদের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওঁর সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন বলে।"

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পার্থপ্রতিমবাবু। তারপর বললেন, "কাল ওয়াশিংটন থেকেও একটা ফোন এসেছিল এ-বাড়িতে। ওদের ডিফেন্স সেক্রেটারিয়েট থেকে। সত্যি বলতে কী, আমরা কনফিউজড।"

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা আপনাদের বাড়ির ফোন নম্বর পেলেন কোত্থেকে?"

"আসলে ভট্চাজ আঙ্কল আমেরিকার নাগরিক। একটা সময় ওখান থেকে উনি বাবার নামে একবার কিছু ডলার পাঠিয়েছিলেন। হয়তো ব্যাঙ্কে কোথাও আমার বাবার নাম এবং কন্ট্রাক্ট নাম্বার ছিল। মনে হয়, ব্যাঙ্ক থেকেই ওঁরা ইনফরমেশনটা পান।"

"যদি আপত্তি না থাকে তা হলে বলবেন, ফোনে ওঁরা ঠিক কী কী ইনফরমেশন চেয়েছিলেন?"

"না, খারাপ কিছু না। ভট্চাজ আঙ্কলের হোয়ারঅ্যাবাউটস ওরা জানতে চাইলেন। নাকি খুব জরুরি দরকার। কোনও একটা কারণে ওঁকে আমেরিকায় ফেরত নিয়ে যেতে চান। তো, আপনাকে এখুনি যা বললাম, ওঁদেরও তাই বলেছি।"

"আর-একটা কথা জানতে চাইছি বলে মাফ করবেন। ডঃ ভট্টাচার্য ঠিক কী কারণে আপনার বাবার কাছে ডলার পাঠিয়েছিলেন?"

"সঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয়, এখানে উনি কোথাও কয়েক বিঘা একটা জমি কিনেছিলেন। ল্যাবরেটরি করার জন্য। বাবা জমি কেনার কাজটা এখানে করে দেন। এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।"

পার্থপ্রতিমবাবু মোটামুটি আমাকে বুঝিয়েই দিলেন, কথা বাড়াতে উনি মোটেই আগ্রহী নন। সেটা বুঝেই আমি উঠে আমার নেমকার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "ডঃ ভট্টাচার্যের কোনও চিঠি বা ছবি যদি খুঁজে পান, তা হলে প্লিজ একটু যোগাযোগ করবেন।"

বাইরে বেরোবার সময় পার্থপ্রতিমবাবু আমার সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। আমাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় বললেন, "আপনাকে আমি কোনও সাহায্য করতে পারলাম না। ডোন্ট মাইন্ড, কালকেতুবাবু।"

মনে-মনে একটু বিরক্ত হলেও তা চেপে রেখে বললাম, "নট অ্যাট অল।"

গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ামাত্রই দেখি কৌশিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হাতে ছোট একটা প্যাকেট। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বলল, "এই নিন। এর ভেতর ভট্চাজদাদুর অনেক চিঠি আছে। মনে হয়, আপনার কাজে লাগবে।"

বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

গাড়িটা স্টার্ট দিতে যাচ্ছি, এমন সময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কৌশিক ফের বলল, "বাবার কাছে আপনি তখন জানতে চাইলেন, ভট্চাজদাদু কী নিয়ে রিসার্চ করেছেন। আমি বলে দিচ্ছি। রক্তবীজ।"

বলেই কৌশিক পিছু হাঁটা দিল। রক্তবীজ? আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

॥ তিন ॥

বাড়ি ফিরেই ইন্টারনেট খুলে আমি প্রথমে সায়েন্টিফিক জার্নাল অব আমেরিকায় একটা ই-মেল পাঠালাম। এই অনুরোধ করে, "যদি আপনাদের কাছে ডঃ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকে তা হলে দয়া করে জানান। শিকাগোর সঙ্গে আমাদের সময়ের তফাত প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টার। তার মানে, ওখানে এখন রাত সাড়ে তিনটে। ওখান থেকে যদি কোনও উত্তর আসে, তা হলে আমাদের সন্ধে সাতটার আগে আসবেন না। অফিস থেকে ফিরে আসার পর মেল চেক করতে হবে। আজ রাত আটটার সময় লন্ডন পাব-এ জুহি চাওলা আর শাহরুখ খানের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা। ইন্টারভিউ নেব। তার মানে রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারব না।"

সেন্টার টেবিলে ডঃ ভট্টাচার্যের চিঠির প্যাকেটটা পড়ে আছে। হাতে সময় আছে বলে ভাবলাম, চিঠিগুলো পড়ে নেওয়া যাক। কোথাও-না-কোথাও একটা ক্লু পাওয়া যাবে। প্যাকেট থেকে চিঠিগুলো বের করে দেখলাম, সময় অনুসারে সাজানো রয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের প্রথম চিঠি উনিশশো চৌষট্টি সালে লেখা। সে-বছরই ডঃ ভট্টাচার্য বস্টনে যান। আর শেষ চিঠিটা উনি পাঠিয়েছিলেন উনিশশো নিরানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে। আফ্রিকার বারকিনা ফাসো থেকে।

ডঃ ভট্টাচার্যের প্রথম চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। হিরণ্ময়বাবুকে উনি লিখেছেন, "এখানে আসার উদ্দেশ্য তোমাকে বলি। বছরদুয়েক আগে তুমি কোনও একটা পুজো সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলে, পুরাণে উল্লেখিত রক্তবীজ নিয়ে। সেই প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবনার উদয় হয়। রক্তবীজের শরীর থেকে পড়া প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা রক্তবীজ জন্ম নিচ্ছে, দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে পড়ছে, এটা কি সম্ভব? একদিন কথায়-কথায় তুমি বলেছিলে, পুরাণে যা লেখা আছে, তা কল্পিত কাহিনী নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানের যুগে এখন তার অনেক কিছু সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন ব্যোমযান। মানে এখনকার যুগের এরোপ্লেন। আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, তোমার ধারণাই ঠিক। আমি বায়োলজির ছাত্র। আমার লাইনে রক্তবীজ নিয়ে রিসার্চ করার কথা সিরিয়াসলি ভাবছি। তুমি দেখে নিও, আমি একদিন-না-একদিন এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করবই এবং সেটা মানুষের মঙ্গলের জন্য।"

ডঃ ভট্টাচার্যের চিঠিটা পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। এও সম্ভব? রক্তবীজ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই আবছা। ছেলেবেলায় কোথাও পড়েছিলাম। হঠাৎই মনে পড়ল, বইমেলা থেকে কিছুদিন আগে ফুল্লরা একটা বই কিনে এনেছিল—হিরণ্ময় বাগচির পৌরাণিক অভিধান। সেখানে নিশ্চয়ই রক্তবীজ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। উঠে গিয়ে শেল্ফ থেকে সেই বইটা নিয়ে এলাম। রক্তবীজ কে, আগে বিস্তৃতভাবে তা জেনে নেওয়া দরকার।

অভিধান থেকে খুঁজে বের করলাম, রক্তবীজ প্রসঙ্গ। দেবী ভাগবত পুরাণে এই রক্তবীজ সম্পর্কে লেখা আছে, "দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষরা তার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতায় আরোহণ করেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ হওয়ার পর স্ত্রীর কুক্ষিপ্রদেশ ভেদ করে মহিষাসুর নির্গত হন। পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে রম্ভও তখন রূপান্তর গ্রহণ করে চিতা থেকে উত্থিত হন। রূপান্তরিত এই রম্ভই 'রক্তবীজ' নামে খ্যাত।"

রক্তবীজের জন্মবৃত্তান্ত মোটেই আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। ডঃ ভট্টাচার্যের মতো একজন নামী বায়োলজিস্ট কী করে এর পিছনে বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে পেলেন তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগল।

দিকে। তবে ওখানে যখন নাইট গার্ডদের কমিটি আছে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করলে কেউ-না-কেউ বলে দিতে পারবে ডঃ জীমূতবাহনের বাড়িটা কোথায়? কৌশিক ছেলেটাকে মনে-মনে ধন্যবাদ জানালাম। ও যদি চিঠিগুলো না দিত, তা হলে আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি জানা সম্ভব হত না, সঞ্জয় আর সুদীশের সমস্যার সমাধান একই জায়গায় করা যাবে। ভাগ্যিস, আজ সিরিটিতে একবার ঢুঁ মেরেছিলাম।

কপাল, কপাল খানিকটা সাহায্য না করলে কোনও রহস্যের কিনারা করা অসম্ভব। কী হত, যদি কৌশিক ছেলেটা আমাকে না চিনত? এত সহজে জানতেই পারতাম না, ডঃ ভট্টাচার্য পঞ্চসায়রেই বাড়ি করেছেন। সুদীশ এলে চমকে যাবে খবরটা শুনে। কথাটা মনে হতেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সুদীশ কি তা হলে আমার মেসেজ পায়নি? হয়তো কোনও কারণে মোবাইলটা ও বন্ধ করে রেখেছে। বেলা প্রায় একটা, সুদীশকে নিয়ে বেলাবেলি পঞ্চসায়রে যেতে হবে। ডঃ ভট্টাচার্যকে পাওয়া গেলে আজ সন্ধের ফ্লাইটেই দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

ডঃ ভট্টাচার্যের সন্ধান কী করে পেলাম, তা সুদীশকে জানানোর দরকার নেই। তাই হিরণ্ময়বাবুর চিঠিগুলো গুছিয়ে প্যাকেটে ভরে ফেললাম। সত্যিই অবিশ্বাস্য। ডঃ ভট্টাচার্যের এই আবিষ্কারের কথা যদি আমাদের কাগজে লিখি তা হলে হইচই পড়ে যাবে। একজন রিপোর্টার হিসাবে লোভ সামলানো মুশকিল। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, এই আবিষ্কারের দাবি কতখানি বিজ্ঞানভিত্তিক। শুধু কয়েকটা চিঠি পড়ে এত বড় একটা খবর করা ঠিক না। আগে ডঃ ভট্টাচার্যকে খুঁজে বের করা যাক। তারপর না হয় লেখা যাবে।

আমাদের সায়েন্স রিপোর্টার পথিক গুহ নানারকম অত্যাধুনিক গবেষণার খবরটবর রাখে। বাজিয়ে দেখার জন্য অফিসে ফোন করে ওকে ধরলাম। "পথিক, রক্তবীজ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?"

প্রথমে আমার প্রশ্নটা ও ঠিক ধরতে পারল না। বলল, "হলিউডের ওই ফিল্মটার কথা বলছেন বুঝি?"

"কোন ফিল্ম?"

"এখনও রিলিজ করেনি। আমি 'প্রিমিয়ার' পত্রিকায় পড়েছি। হলিউডে তৈরি। ওরা নাম দিয়েছে ব্লাডম্যান। সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যানের মতো ফিল্ম। ব্লাডম্যানের রক্ত থেকে হাজার ব্লাডম্যান জন্ম নিচ্ছে। আমাদের পুরাণের সেই রক্তবীজের গল্পের মতোই।"

রক্তবীজের থিম নিয়ে হলিউডে একটা সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম তৈরি হচ্ছে, জানতাম না। শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। বললাম, "ফিল্মে তারপর কী হল?"

"হলিউডের ছবিতে যা হয়। ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল আর্নল্ড সোয়ার্জনেগারকে। বুদ্ধি করে ব্লাডম্যানদের সে কোণঠাসা করল একটা বিশাল জঙ্গলে। তারপর জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে, পুড়িয়ে শেষ করে দিল ব্লাডম্যানের বংশ।"

"একটা কথা আমায় বলো তো পথিক, সত্যিই রক্তবীজের মতো কিছু আবিষ্কার করা কি এ যুগের বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব?"

পথিক বলল, "এখন বিজ্ঞান যে জায়গায় পৌঁছেছে কালকেতুদা, কোনও কিছুই অসম্ভব না। একটা আমেরিকান জার্নালে সেদিন পড়ছিলাম, রক্তবীজের মতো প্রাণী উৎপন্ন করা সম্ভব। আমেরিকায় বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রবন্ধটা আপনাকে দিতে পারি। তবে আগামীকাল। বাড়ি থেকে আনতে হবে। পড়লেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু হঠাৎ আপনি এসব জানতে চাইছেন কেন?"

বললাম, "এমনিই। একটা জায়গায় কথা হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই তোমার কাছে জানতে চাইলাম।"

"হয়টা কী জানেন, ধরুন কেউ রক্তবীজের ফসিল পেয়েছেন। তাতে তার দেহের কোষ থাকবেই। এবার সেই কোষের নিউক্লিয়াসটাকে আলাদা করে নিতে হবে বেশ যত্নের সঙ্গে, ডিমের ভেতর থেকে কুসুম বের করে নেওয়ার মতো। তারপর সেই নিউক্লিয়াসটাকে চালান করতে হবে এমন একটা কোষে, যার নিউক্লিয়াস বের করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কি না ফাঁকা কোষে। সেটা মানুষের হতে পারে, শিম্পাঞ্জি বা গোরিলার কোষও হতে পারে। এবার এই কোষটাকে টেস্টটিউবে বাড়িয়ে নিলে প্রাণীর জন্ম দেওয়া সম্ভব। অনেক উঁচু স্তরের বায়োলজির ব্যাপার। টেলিফোনে আপনাকে বোঝানো অসম্ভব।"

সত্যিই আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ডঃ ভট্টাচার্য রক্তবীজের ফসিল পেয়েছিলেন কি না, পেলে কোথায় পেয়েছিলেন, তা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে জেনে নিতে হবে। আপাতত আমি এটুকু জেনেই খুশি, রক্তবীজের জন্ম দেওয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্ভব। পথিক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ঠিক আছে, ছাড়ছি ভাই, থ্যাঙ্ক ইউ।"

পথিকের সঙ্গে কথা বলে রিসিভারটা ক্রেডলে রেখেই আমি লাফিয়ে উঠলাম। তা হলে সম্ভব! ডঃ ভট্টাচার্য তা হলে অসাধ্য সাধন করেছেন। আজই আমাদের কাগজে বিরাট করে এই আবিষ্কারের খবরটা ছাপতে হবে। রিডিংরুমে গিয়ে টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরাটা বের করে হাতের কাছে এনে রাখলাম। পঞ্চসায়রে নিয়ে যেতে হবে। ডঃ ভট্টাচার্যের ইন্টারভিউ ছাপতে হবে ছবিসহ। উফ, একটা স্কুপ আমার হাতের মুঠোয়, ভাবতেই কেমন লাগল।

রিডিংরুমে ঢুকে আলমারিটা খোলামাত্রই পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে সুদীশের গলা, "এই, ডঃ ভট্টাচার্যের খোঁজ পেয়ে গেছি রে।"

জানি, পায়নি। পেতে পারে না। তবুও বললাম, "কী করে পেলি?"

"তিনদিন আগে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে উনি কলকাতায় আসেন। প্যাসেঞ্জার লিস্টটা চেক করতে বলেছিলাম। এইমাত্র এয়ারলাইন্স থেকে আমাকে খবরটা জানাল। এয়ারপোর্ট থেকে উনি একটা প্রি-পেড ট্যাক্সি নিয়েছিলেন। সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে খোঁজ করতে গিয়েই আমার এত সময় লেগে গেল। না হলে তোর মেসেজের উত্তর আগেই দিতে পারতাম।"

"ড্রাইভারকে খুঁজে পেলি?"

"পেয়েছি। সে বলল, 'ট্যাক্সিতে দু'জন লোক উঠেছিল। একজন সাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা আর অন্যজন বেশ ইয়ং। দু'জনে গল্‌ফ গ্রিনের কাছে গল্‌ফ টাওয়ার্স বলে একটা বিরাট বাড়ির সামনে নেমে যায়।' তার মানে তোর বাড়ির ঠিক উলটো দিকের বাড়িটা। বল, কী আশ্চর্য তাই না? সকালবেলা আমরা যে লোকটার খোঁজখবর করছি, সে-ই কিনা তোর বাড়ির অত কাছে একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে।"

"তুই শিওর ডঃ ভট্টাচার্য গল্‌ফ টাওয়ার্সে আছেন?"

"মোর দ্যান শিওর। ড্রাইভারটা বলল, 'দু'জনের মধ্যে বয়স্ক যিনি, তিনি পাঁচশো টাকার একটা নোট দিয়েছিলেন। বাকি টাকাটা আর ফেরত নেননি।' এরকম প্যাসেঞ্জারকে তো ওদের মনে থাকবেই। আমি অলরেডি একজন ওয়াচার পাঠিয়ে দিয়েছি। সে খোঁজ নিয়ে জানাবে।"

"ডঃ ভট্টাচার্য দিল্লি থেকে ফ্লাইটে একা এসেছিলেন, না দু'জনে?"

"সেটা তো চেক করিনি। এমনও হতে পারে অন্য লোকটা হয়তো ওঁকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গেছিল।"

"তা হতে পারে। তুই কি এখন এদিকে আসবি?"

"কেন? কোনও দরকার আছে? আমি ভাবছিলাম, রাতের দিকে গল্‌ফ টাওয়ার্সে যাব। ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। রাত একটায় কে এল এম-এর একটা ফ্লাইট আছে। কলকাতা থেকে সেটা দিল্লি যায়। সেই ফ্লাইটে দুটো সিট বুক করে রেখেছি। ওঁর সঙ্গে আমাকে দিল্লি যেতে হবে।"

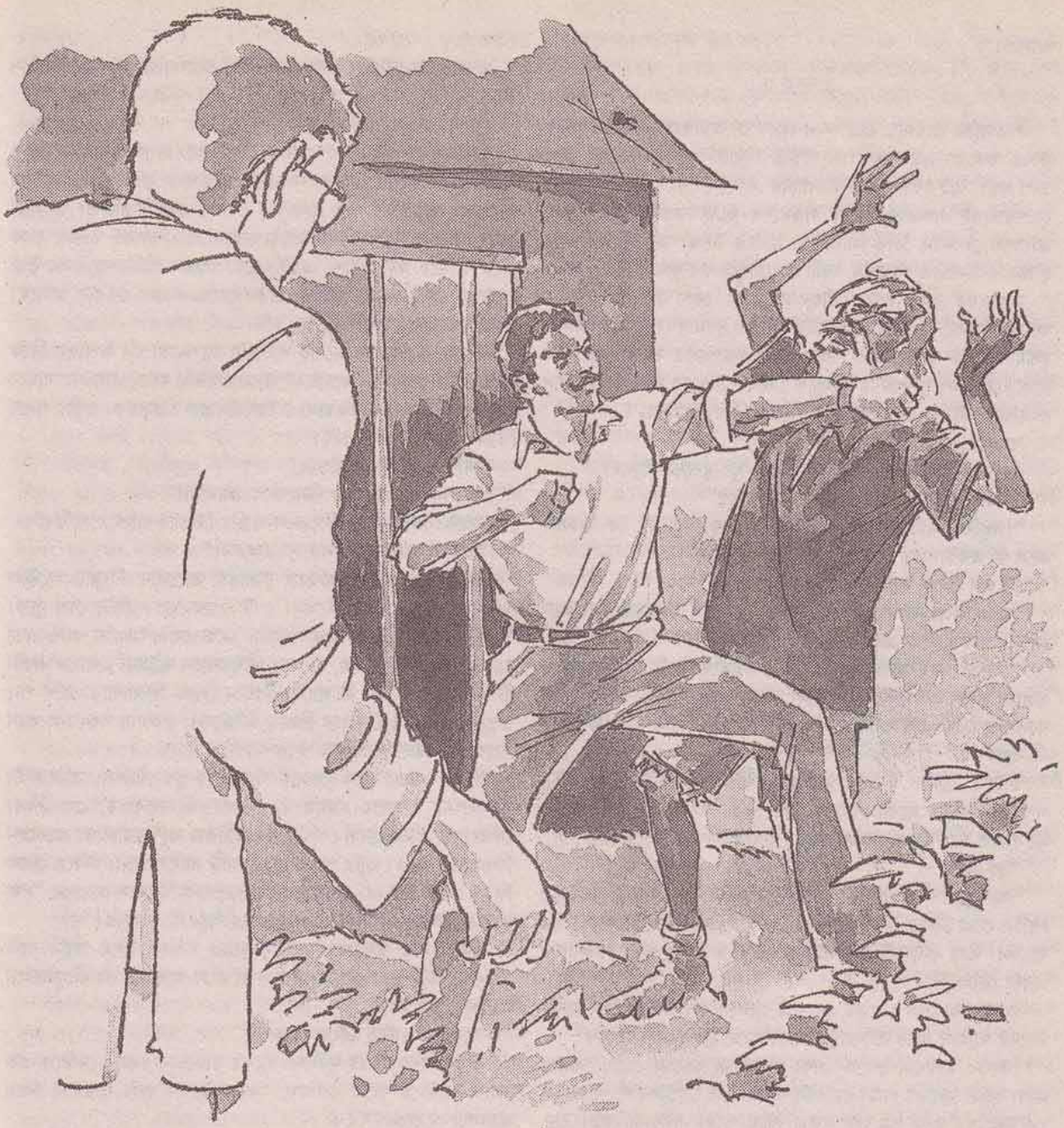

"তুই কেন?"

"তোর বাড়ি থেকে বেরোবার পরই দিল্লি থেকে মিঃ পদ্মনাভনের ফোন এসেছিল। যতটা ইম্পর্ট্যান্ট ভেবেছিলাম ডঃ ভট্টাচার্যকে, তার চেয়েও অনেক বেশি। সি আই এ এজেন্টরা ওঁর পিছনে লেগে রয়েছে। উনি আমেরিকান সিটিজেন। কোনও কারণে সি আই এ-র লোকজন ওঁকে ওয়াশিংটন নিয়ে যেতে চায়। মিঃ পদ্মনাভন বললেন, আজ দুপুরেই কাঠমাণ্ডু থেকে সি আই এ-র একজন এজেন্ট কলকাতায় পৌঁছেছে। বুঝতেই পারছিস, কাদের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে আমাকে।"

সি আই এ সম্পর্কে সুদীশ যা বলছে, তা সত্যি হতেও পারে। কেননা, আজ সকালেই পার্থপ্রতিমবাবু বললেন, ওয়াশিংটন থেকে উনি ফোন পেয়েছেন। কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্য সম্পর্কে সুদীশ যা বলছে, তা কি ঠিক? জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তেরো তলা গল্‌ফ টাওয়ার্সের ফ্ল্যাটগুলো দেখা যাচ্ছে। কোন ফ্ল্যাটে ডঃ ভট্টাচার্য আছেন, কে জানে? আমার মন অবশ্য বলছে পঞ্চসায়রে গেলে ডঃ ভট্টাচার্যকে পাওয়া যাবেই। সেখানে সুদীশ আমার সঙ্গে গেলে ভাল হয়। তাই বললাম, "তোর হাতে তো এখন সময় আছে। একবার আমাদের সঞ্জয়দের ওখানে যাওয়া দরকার।"

"কেন রে? ওহ্, সেই পঞ্চসায়রের ঘটনাটা। আরে, ওটা তেমন কিছুই না। আমি ইস্ট যাদবপুর থানায় কথা বলেছি। ভাম জাতীয় এক ধরনের অ্যানিম্যালের কাণ্ড। আগে যখন ওই অঞ্চলে ভেড়ি ছিল, তখনও এই ধরনের ঘটনা ঘটত। থানা থেকে আজ দু'জন সেন্ট্রিকে ওখানে পাঠাবে। লোকের মনে যাতে সাহস ফিরে আসে।"

বললাম, "তুই বলছিস বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না ওটা অত সহজ ব্যাপার। তুই একবার আমার সঙ্গে চল। আখেরে তোর লাভই হবে।"

সুদীশ বলল, "তুই বলছিস যখন, চল। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি

আসছি।"

॥ চার ॥

পঞ্চসায়র জায়গাটা এত সুন্দর আগে তা জানতাম না। প্রচুর সবুজ ফাঁকা জায়গা ওই অঞ্চলে। পাঁচটা বিরাট পুকুরও আছে পুরো এলাকায়। এই কারণেই জায়গাটার নাম বোধ হয় পঞ্চসায়র। বেশিরভাগই একতলা বাড়ি। সঞ্জয়দের বাড়ি যাওয়ার পথে এক জায়গায় দেখলাম, টিভি সিরিয়ালে শুটিংও হচ্ছে। আর্টিস্টদের মধ্যে দু'জনকে চিনতেও পারলাম, গার্গী রায়চৌধুরী অব কুনাল মিত্র।

সঞ্জয়দের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা তিনটে। গেটের কাছেই পোলট্রির শেড। একনজরে দেখেই বুঝে গেলাম, কাল রাতে দুষ্কর্মটা যে-ই করে থাকুক, ভাম নয়। একপাশের জাল ছেঁড়া। যে উপড়েছে, বেশ বলশালী। আমাকে দেখেই সঞ্জয়ের মা বেরিয়ে এসে বললেন, "কী বিপদের মধ্যেই না পড়েছি, বল তো বাবা।"

বললাম, "সঞ্জয় কোথায়?"

"ও তো নাইট পার্টির অফিসে গেছে। খুব মুষড়ে পড়েছে।"

"নাইট পার্টির অফিসটা কোথায় কাকিমা?"

"পিছনেই, মাঠের গায়ে। ওখানে অনেকেই আছে। কে একজন এসে কী একটা খবর দিল, ও সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়েছে।"

"ওখান থেকে আমরা ঘুরে আসি তা হলে?"

"যাও বাবা। আমাদের এই বিপদে প্রথমেই তোমার কথা মনে পড়ল। তাই সঞ্জুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"ফেরার সময় আবার আসব," বলে সঞ্জয়দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সুদীশ এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস কালকেতু। এটা এত সাধারণ ব্যাপার নয়। জেলার পুলিশ এত ক্যালাস, কী বলব!"

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে মাঠের কাছে পৌঁছতেই দেখি, নাইট গার্ডদের টালির ঘরের সামনে বেশ ভিড়। আমাকে দেখেই সঞ্জয় উত্তেজিত হয়ে বলল, "কালকেতুদা, কালপ্রিট আমরা ধরে ফেলেছি।"

"কে সে?"

"আমাদের পঞ্চাসায়রের পাশেই শ্রীনগর বলে একটা জায়গায় পাঁচিল ঘেরা বিশাল একটা বাগানবাড়ি আছে। ভদ্রলোক নাকি বিদেশে থাকেন। তাঁর বাড়িতেই রাক্ষসটাকে দেখে ফেলেছে আমাদের পাড়ার একটা ছেলে।"

সঞ্জয় কথা শেষ করতেই একসঙ্গে অনেকে কথা বলতে শুরু করল। তাদের থামিয়ে দিয়ে বললাম, "যে দেখেছে, সে এখানে আছে?"

ভিড়ের মাঝখান থেকে একটা দশ-বারো বছরের ছেলে বেরিয়ে এল। হাতে ক্রিকেট ব্যাট। ছেলেটা বলল, "ওই বাড়িটার পাশে আমরা খেলছিলাম। গুড্ডু ছয় মারায় বল গিয়ে পড়ল বাগানবাড়িতে। তো, আমি পাঁচিলে উঠে দেখতে গেলাম, বলটা কোথায় পড়েছে। দেখি কি না, বাগানে একটা রাক্ষস ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ছেলেটা যা বর্ণনা দিল, তাতে সব মিলে যাচ্ছে। তা হলে ঠিক পঞ্চসায়রে ডঃ ভট্টাচার্যের বাড়ি নয়। পঞ্চসায়রের পিছনে শ্রীনগরে। সঞ্জয়কে বললাম, "ওই বাড়িতে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?"

সঞ্জয় বলল, "চলুন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আর্মস আছে?"

সুদীশ গম্ভীর গলায় বলল, "সেসব তোমায় ভাবতে হবে না। আগে বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দাও।"

ডঃ ভট্টাচার্যের বাড়ির দিকে হাঁটার পথে সুদীশ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই কালকেতু... ছেলেটা রাক্ষস না কী বলল, ব্যাপারটা কী?"

ফিসফিস করে বললাম, "চল, তা হলেই বুঝতে পারবি। আমার আন্দাজ যদি সঠিক হয়, তা হলে তোকে আর রাতের দিকে গল্‌ফ টাওয়ার্সে অপারেশন করতে হবে না। মনে হয় এখানেই তুই ডঃ ভট্টাচার্যকে পেয়ে যাবি।"

কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীশ। তারপর বলল, "কী বলছিস তুই?"

হেসে বললাম, "ঠিকই বলছি।"

মিনিটপাঁচেক কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমরা সেই বাগানবাড়িতে পৌঁছলাম। দরজায় শাটার। সেখানে ছোট্ট করে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান'। আমাদের সঙ্গে জনাকুড়ি লোক। বেশ উত্তেজিত। উৎসাহী দু'-তিনজন শাটারে দুমদাম লাথি মারতে শুরু করল। তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল সুদীশ। এরই মাঝে একজন পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে। সে-ই বলল, "বাড়ির ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসছে। কেউ গণ্ডগোল কোরো না।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শাটারটা আপনাআপনি উপরের দিকে উঠে গেল। বুঝলাম, রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবস্থা আছে। দরজার সামনে কাঁচা-পাকা চুল ও দাড়িওয়ালা সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, "কাকে চাই?"

সুদীশ বলল, "আপনাকে।"

"আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

"আমি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সে আছি। ভেতরে আসতে পারি?"

"আসুন। তবে সবাই নয়, দু'-একজন।"

আমি আর সুদীশ ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক রিমোট কন্ট্রোল শাটারটা ফের নামিয়ে দিলেন। গেট থেকে মূল বাড়িটা বেশ দূরে। ভদ্রলোক আগে হেঁটে যাচ্ছেন। হাঁটার মধ্যে একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। দেখেই মনে হল, ইনি ডঃ জীমূতবাহন ভট্টাচার্য। পরনে একটা টি শার্ট ও বারমুডা। টি শার্টের পিছনে লেখা 'শিকাগো'। খালি পা। ভদ্রলোক মনে হয়, দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দরজায় গণ্ডগোল শুনে পায়ে চপ্পল গলানোর সময় পর্যন্ত পাননি।

বাড়ির ভেতর ঢুকে বুঝলাম, ভদ্রলোক খুব শৌখিন। ড্রয়িংরুমটা খুব সুন্দর সাজানো। দামি সোফাসেট, আসবাবপত্র, শো পিস। দেওয়ালে দামি অয়েল পেন্টিং। আমেরিকায় প্রচুর রোজগার করেছেন নিশ্চয় ভদ্রলোক। প্রচুর পয়সা ঢেলে বাড়ি সাজিয়েছেন। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সোফায় বসে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "দয়া করে আপনাদের পরিচয় দিন। তারপর বলুন কী দরকার?"

সুদীশ কিছু বলার আগেই দু'জনের পরিচয় দিয়ে আমি বলে উঠলাম, "যদি ভুল করে না থাকি, তা হলে আপনিই ডঃ জীমূতবাহন ভট্টাচার্য, তাই না?"

"ইয়েস। আমিই জীমূতবাহন।"

কথাটা শোনামাত্রই সুদীশের মুখের রং বদলে গেল। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে আমি বললাম, "আপনিই তা হলে রক্তবীজ নিয়ে গবেষণা করেছেন?"

ডঃ ভট্টাচার্যের ভ্রূ একবার কুঁচকে উঠেই মিলিয়ে গেল। উনি হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক করেই আপনারা এসেছেন?"

বললাম, "অফ কোর্স।"

"আমার সম্পর্কে আপনারা আর কী জানেন?"

"আপনি খুব বিপদের মধ্যে আছেন। এই মুহূর্তে অন্তত দুটো দেশের সিক্রেট এজেন্ট আপনাকে গুম করার চেষ্টায় আছে।"

"দুটো নয়। অন্তত সাত-আটটা দেশের। আপনারা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে নন।"

"না।"

"নিশ্চিন্ত হলাম। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?"

সুদীশ বলল, "আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমাদের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে সেরকমই নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।"

"আপনার পরিচয়পত্রটা কি একবার দেখতে পারি?"

সুদীশ সঙ্গে-সঙ্গে বুকপকেট থেকে কার্ডটা বের করে দেখাল। সেটা ভাল করে দেখে ডঃ ভট্টচার্য বললেন, "মিনিস্ট্রি থেকে কি আপনি কোনও চিঠি এনেছেন?"

"না, ওরা একটা ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছে। সেটা আমার অফিসে রয়েছে।"

"দেখুন মিঃ নাগ, আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন। আমি আপনার মুখের কথা শুনতে বাধ্য নই।"

উত্তরটা শুনে মনে হল সুদীশ রেগে গেল। কড়া গলায় ও বলল, "ডঃ ভট্টাচার্য, আপনার নিরাপত্তার জন্যই ওরা আমাকে দায়িত্বটা দিয়েছেন।"

"না। সেজন্য নয়। ওঁরা ওঁদের দরকারেই আমাকে নিয়ে যেতে চান। মিঃ নাগ, আপনি সেই দরকারটা বোধ হয় জানেন না।"

এবার আমি বললাম, "আপনি জানেন?"

"অবশ্যই। কারগিলে দু'দফার যুদ্ধে প্রচুর ভারতীয় সেনা মারা গেছে। আপনাদের মিনিস্ট্রি আর লোকক্ষয় করতে চায় না। সেজন্যই আমার দ্বারস্থ হচ্ছে। রক্তবীজের দল নিয়ে আমাকে বর্ডারে যেতে বলা হবে। মানুষের বদলে ওরাই যুদ্ধ করবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই অনুরোধ শুধু আপনাদের মিনিস্ট্রিই আমাকে করছে না। সাত-আটটা দেশের কাছ থেকে পেয়েছি।"

শুনে আমার বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার রক্তবীজ আধুনিক অস্ত্র চালাতে পারবে?"

"ওদের শিখিয়ে দিলেই চালাতে পারবে। যুদ্ধ করার জন্যই যে ওদের জন্ম। আপনাদের আর কিছু বলার আছে?"

ডঃ ভট্টাচার্যের কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত, উনি আর কথা বাড়াতে চান না। সুদীশের মুখ থমথম করছে। পুলিশে কাজ করে। ওর ধৈর্য আমার থেকে কমই। তাই ও কিছু বলার আগে আমি বললাম, "আপনি দাবি করছেন বটে, রক্তবীজ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তার প্রমাণ এখনও আমরা পাইনি।"

"প্রমাণ দিতে আমি বাধ্য নই।"

সুদীশ এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাধ্য নন মানে? জানেন, আপনাকে আমি এখনই অ্যারেস্ট করতে পারি? আপনারই পোষা রক্তবীজ না... কী, লোকের ক্ষতি করে বেড়াচ্ছে, তার দায় কে নেবে?"

সুদীশের কড়া কথা শুনে ডঃ ভট্টাচার্য বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। উলটে উনি বললেন, "মিঃ নাগ, আমার সঙ্গে যত গলা নামিয়ে কথা বলবেন, ততই মঙ্গল। আমার আবিষ্কারটি ঝামেলা পছন্দ করে না। এখনই হয়তো উদয় হবে। আমার চোখের ইশারা পেলে আপনাদের ছিঁড়ে ফেলতেও পারে। গাজিয়াবাদে এরকম একটা ঘটনা কিন্তু ঘটেছে।"

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমি বললাম, "ডঃ ভট্টাচার্য, আপনি একটু সহযোগিতা করুন। বাইরে অন্তত শ'খানেক লোক জড়ো হয়ে আছে। আমাদের কিছু হলে তারা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না। মানছি, আপনি যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার করেছেন। নোবল প্রাইজ পাওয়ারও যোগ্য। আপনার মতো একজন টপ লেভেলের বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এরকম হুমকি আশা করি না।"

"আমিও আপনাদের কাছ থেকে গাজোয়ারি কথাবার্তা আশা করি না।"

"মাফ করবেন, আমরা যদি আপনাকে কোনওরকম আঘাত দিয়ে থাকি। আপনি তো এ-দেশেই জন্ম নেওয়া মানুষ। নাগরিক যে দেশেরই হোন না কেন। আপনি আমাদের গর্ব। হিরণ্ময়বাবুর কাছে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি।"

কথাগুলো শুনে কী যেন ভাবলেন ডঃ ভট্টাচার্য। তারপর বললেন, "হিরণ্ময়কে আপনি চিনতেন?"

"খুব ভাল করে চিনতাম। ইউনিভার্সিটিতে উনি আমাদের পড়াতেন।" একের-পর-এক আমি মিথ্যে বলে যাচ্ছি, যদি তাতে কোনও কাজ হয়। "শেষের দিকে উনি কেন যে আপনার উপর ভয়ানক রেগেছিলেন, সে-কথাও আমার অজানা নেই।"

"তা হলে তো আপনি অনেক কথাই জানেন। যাকগে, আপনি হিরণ্ময়ের ছাত্র, সেজন্য আপনাকে আমি প্রমাণ দেব, আমি কী আবিষ্কার করেছি। আমার সঙ্গে আসুন। নিজের চোখেই সব দেখে যান। কিন্তু আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। আমাকে নিয়ে কোনও কিছু লেখা চলবে না।"

আমি হ্যাঁ বা না কিছু বলার আগেই ডঃ ভট্টাচার্য সোফা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাড়ির পিছন দিকে একটা শেড-এর মতো আছে। লোহার রড দিয়ে সে জায়গাটা ঘেরা। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে উনি শাটার তুলতেই একটা বোটকা গন্ধ নাকে এসে লাগল। তার পরই ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, "এই দেখুন আমার রক্তবীজ।"

হাইট পাঁচ ফুটের বেশি না। মানুষ, আবার মানুষও না। সারা গায়ে লোম। চিড়িয়াখানার বনমানুষের মতো দেখতে প্রাণীটি উঠে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। এই তা হলে রক্তবীজ! কোনও পরিস্থিতিতেই আমি সাধারণত ভয় পাই না। কিন্তু রক্তবীজ নামক প্রাণীটি দেখে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা বরফের একটা চাঁই হঠাৎ নেমে গেল। দেখেই মনে হল, প্রাণীটি অসীম বলশালী এবং হিংস্র। ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, ইচ্ছে করলে সে দু'হাতে আমাদের ছিঁড়ে ফেলতে পারে। লোহার রডের ওপাশে রক্তবীজ গরগর করে আওয়াজ করছিল। হঠাৎ মুখ খিঁচিয়ে উঠল। লক্ষ করলাম, ওই সময়টায় সুদীশ পকেটে হাত দিয়েছিল। সম্ভবত রিভলভারটা তৈরি রাখার জন্য।

প্রাথমিক ভয়টা কেটে যাওয়ার পর পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য আমি বললাম, "ডঃ ভট্টচার্য, আপনার রক্তবীজ দেখতে এত ভয়ঙ্কর কেন?"

"আমার কোনও উপায় ছিল না মিঃ নন্দী। যে সিরামটা আমি তৈরি করেছি, তা কোনও মানুষের উপর প্রয়োগ করার সুযোগ পাইনি। আমেরিকা থেকে গোপনে আফ্রিকার এক অল্প পরিচিত দেশ বারকিনা ফাসোয় গিয়ে আমাকে রিসার্চ শেষ করতে হয়েছে। এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে। ওখানে বিশেষ ধরনের বনমানুষের বাস। ভয়ানক হিংস্র। সেই বনমানুষের বংশধর এরা। যাকগে, এবার আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে তো? এবার চলুন।"

রক্তবীজের চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। ড্রয়িংরুমের দিকে আমি পা বাড়ানোর আগেই হঠাৎ সুদীশ কাণ্ডটা করে বসল। "না, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি," বলেই পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ও রক্তবীজকে গুলি করে বসল। অত সামনে থেকে গুলি করার জন্য রক্তবীজের শরীরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্য দিকের দেওয়ালে।

"ওহ, মাই গড, এ কী করলেন আপনি?" চিৎকার করে উঠলেন ডঃ ভট্টাচার্য, "আপনাকে আমি ছাড়ব না। আই উইল কিল ইউ।" বলেই সুদীশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন উনি। আচমকা ধাক্কা খেয়ে সুদীশ টাল সামলাতে পারল না। ওর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে এসে পড়ল আমার পায়ের সামনে। আমি তাড়াতাড়ি ঘাসের উপর থেকে রিভলভারটা তুলে নিলাম।

সুদীশ বলেছিল বটে ডঃ ভট্টাচার্যের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু উনি যেভাবে লড়তে শুরু করলেন তাতে এক সময় মনে হল, ওঁর বয়স পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের বেশি না। খালি হাতে একজন অন্যজনকে কব্জায় আনার চেষ্টা করছে। সুদীশের ঘুসিতে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে ডঃ ভট্টাচার্যের। তবুও তিনি প্রাণপণ হাত-পা ছুড়ে যাচ্ছেন। সুদীশ নামকরা অপরাধীদের বাগে আনতে অভ্যস্ত। ক্যারাটে, কুংফু জানা

লোক। ওর সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য পারবেন কেন? দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি চিত হয়ে শুয়ে হাঁফাতে লাগলেন। সেই সুযোগে সুদীশ পকেট থেকে হ্যান্ডকাফ বের করে ডঃ ভট্টাচার্যের হাতে পরিয়ে দিল।

দু'জনের মারপিট দেখার ফাঁকে লক্ষই করিনি, রক্তবীজের কী হল? হঠাৎ গরগর শব্দ শুনে ঘুরে তাকালাম। গুলি-খাওয়া রক্তবীজ দেওয়ালের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ওর রক্ত থেকে আরও চার-পাঁচটা রক্তবীজ জন্মে গেছে। কী হিংস্র ওদের চোখ-মুখ। সামনে এসে ওরা লোহার রড বাঁকানোর চেষ্টা করছে। চোখের সামনে ভোজবাজির মতো ঘটনা দেখে আতঙ্কে আমার হাত-পা আটকে গেল। যেন হলিউডের কোনও সায়েন্স ফিকশন সিনেমা দেখছি। বললে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। রক্তবীজের সংখ্যা আরও বাড়ছে। আর কিছুক্ষণ সময় দিলে পুরো গরাদে ভরে যাবে। চোখের সামনে ওদের জন্মাতে দেখে এই প্রথম আমার মনে হল, পুরাণে যেসব ঘটনার কথা লেখা আছে, তার কোনওটাই মিথ্যে নয়।

আমার মতোই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুদীশ। হঠাৎ বলল, "এদের কী ব্যবস্থা করা যায় বল তো? যা কিছু করতে হবে, দু'-চার মিনিটের মধ্যেই।"

পথিকের কাছ থেকে আজই দুপুরে শোনা হলিউডের সেই 'ব্লাডম্যান' ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, "এমন কিছু করিস না, যাতে এদের শরীর থেকে রক্ত বের হয়। এদের শেষ করার একমাত্র উপায় আগুনে পুড়িয়ে মারা।"

"গুড সাজেশন।" বলেই সুদীশ দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ক্লান্ত হয়ে রাত ন'টা নাগাদ বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। শাহরুখ খানের ইন্টারভিউ নিতে যাওয়ার ইচ্ছেও হল না আজ। পঞ্চসায়রের ওই শেড-এ সুদীশ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর রক্তবীজের দল যেভাবে আর্তনাদ করছিল, তা এখনও কানে লেগে রয়েছে। আমার খুবই খারাপ লাগছিল তখন ডঃ ভট্টাচার্যকে দেখে। ভদ্রলোকের পঁয়ত্রিশ বছরের সাধনা কয়েক মিনিটের ভেতর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। উনি করুণ মুখে জ্বলন্ত শেড-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটা কথাও বললেন না। এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্য সুদীশ যখন ডঃ ভট্টাচার্যকে গাড়িতে তুলছিল, তখন শুধু লক্ষ করলাম, ওঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

সারাটাদিন মারাত্মক ধকল গেছে। একবার স্নান করে নিলে ভাল হত। বাথরুমে ঢোকার জন্য পা বাড়াতেই ফোনটা বেজে উঠল। ভাবলাম, সুদীশের ফোন। রিসিভার তুলেই বললাম, "কালকেতু বলছি।"

"আপনাকেই চাইছিলাম। আমার নাম জীমূতবাহন ভট্টাচার্য।"

"চাট্টা করছেন? জীমূতবাহন ভট্টাচার্য তো এখন দিল্লির ফ্লাইটে।"

"ভুল। আপনার বন্ধুর সঙ্গে যিনি দিল্লি যাচ্ছেন, তিনি নকল জীমূতবাহন। আসলের ক্লোন। আমিই আসল। নকলের চুল আর দাড়িতে কাঁচা-পাকা রং দেখে আপনার মতো রহস্যভেদীও যে ভুল করবে, আমি ভাবতে পারিনি। যাকগে, হিরণ্ময়ের ছেলের কাছ থেকে আপনার ফোন নম্বরটা পেয়েই আপনাকে একটা কথা জানানোর প্রয়োজন মনে করলাম। কিছুক্ষণ পরই আমি একটা এমন দেশে উড়ে যাচ্ছি, যারা খুব শিগগির যুদ্ধ শুরু করবে প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধ নাকি বছরদশেক ধরে চলবে। আমি রক্তবীজ সাপ্লাইয়ের বরাত পেয়েছি। দুই বিলিয়ন ডলারের। অঙ্কটা মন্দ নয়, কী, তাই না?"

কথাগুলো শুনে মনে হল, কে যেন ঠাস করে গালে একটা চড় মেরে গেল। কোনওরকমে বললাম, "শুধু... শুধুমাত্র টাকার লোভে আপনি মানুষের এত বড় একটা ক্ষতি করবেন?"

প্রশ্নটা শুনে ও প্রান্তে হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন আসল জীমূতবাহন। তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "মানুষ? এই পৃথিবীতে তারাই তো মানুষ, যাদের টাকা আছে। মিঃ নন্দী, ছেলেবেলায় বাবাকে চোখের সামনে মরতে দেখেছিলাম। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারিনি। তখনই বুঝেছিলাম, টাকাই সব। যাকগে, এসব কথা আপনাকে বলে কোনও লাভ নেই। আপনি শখের গোয়েন্দা। আপনার ফোন নম্বরটা আমার কাছে রইল। মনে হয়, ফের যোগাযোগ হবে।"

"একটা কথা বলবেন ডঃ ভট্টাচার্য? হিরণ্ময়বাবুর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হওয়ার কারণটা ঠিক কী?"

"সেটা নাই বা শুনলেন। তবে আমার কর্তব্য আমি করে এসেছি। আজই ওর ছেলের হাতে এক লাখ ডলারের একটা চেক দিয়ে এসেছি। আমি মনে করি, আমার এই সাফল্যের পিছনে হিরণ্ময়েরও হাত আছে। রক্তবীজ সম্পর্কে ও-ই প্রথম আমার আগ্রহ জাগিয়েছিল। আর-একটা কথা, আপনার রিলেটিভ, সজ্জন বলে ছেলেটির নামেও হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছি। কালই পেয়ে যাবে। ওর যা ক্ষতি হয়েছে, আশা করি, তা পুষিয়ে যাবে। আচ্ছা, গুডবাই। ভাল থাকবেন।"

বলেই লাইনটা কেটে দিলেন জীমূতবাহন। মোবাইলে দেখলাম, ভদ্রলোক ফোনটা করেছেন টু ফোর ওয়ান সেভেন এক্সচেঞ্জ থেকে। তার মানে, আমাদের গলফ গার্ডেন্স এলাকাতেই আছেন। সুদীশ ঠিকই বলেছিল, উনি গলফ টাওয়ার্সেই উঠেছেন। নাঃ, ওঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, আমি শখের রহস্যভেদী হতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে টক্কর দেওয়া অত সোজা না। মনটা শক্ত করে আমি নীচে নেমে এলাম। আমার বাড়ির ঠিক উলটো দিকেই গলফ টাওয়ার্সে যাওয়ার জন্য।